সূচী

বৈশাখ, ১৩২১

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১

বঙ্গদর্শন

সম্পাদকের বৈঠক

বরপণের কথা

উপস্থিত—বিজয় ও সম্পাদক

বিজয়—সেদিন Empire-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। কিন্তু আপনি যে আদর্শের Empire বা সাম্রাজ্যের কথা বলেছেন, সেরূপ Empire যে কেবল এখনও কোথাও গড়ে নাই, তাহা নয়; যা'রা নিজেদের Imperialist বলে জগতে জাহির করিতে চায়, তাদেরও এ ভাবটা জন্মায় নাই। তারাও তো এ আদর্শকে এখনও ধরিতে পারে নাই। এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে এই মৃগ-তৃষ্ণিকার দিকে ছুটিয়া হয়রাণ হওয়ার কি কোনও কারণ আছে?

সম্পাদক—দুনিয়ায় আমাদের বেঁচে থাক্‌বার যদি কোনও হেতু থাকে তবে এইটাই তার সর্ব্বপ্রধান হেতু। জগতের প্রাচীন জাতি সকল লোপ পাইয়াছে; আমরা যে এখনও লোপ পাই নাই, তার একমাত্র কারণ এখনও সংসারে আমাদের কর্ম্ম আছে, দুনিয়াকে দিবার আছে। যে দিন এ কর্ম্ম-শান্তি হবে, এ দেওয়া নিঃশেষ হবে, সে দিন আর আমাদের স্বতন্ত্র জাতিরূপে থাকার কোনও প্রয়োজন থাকুবে না। সে দিন আমরাও বিলুপ্ত হব।

বিমলের প্রবেশ।

বিমল—আর মশায়! বিলুপ্ত হবার কি আর বিলম্ব আছে। প্লেগ, ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা, বসন্ত, টাইফয়েড্—এ সকলের তো উপদ্রব আছেই, কিন্তু তার উপরে যদি মেয়েগুলো এম্নি করে আত্মহত্যা কর্ত্তে আরম্ভ করে, তবে কি আর এ জাত বাঁচতে পারে? স্নেহলতার কথা তো শুনেছেন! যারা মা হয়ে বংশরক্ষা কর্ব্বে, তারা যদি এমন ভাবে মরতে আরম্ভ করে, তা'হলে নির্ব্বংশ হওয়া বড় দূরের কথা নয়। আপনি দেখ্‌ছি এখনও এ কথা কিছু লেখেন নি! তাই জিজ্ঞাসা করতে এলাম।

সম্পাদক—কি লিখ্‌ব বল?

বিমল—কি লিখ্‌বেন? এখন কি আর কোনও কিছু লিখ্‌বার আছে? সমাজ যে ডুবলো!

সম্পাদক—সমাজকে এই সমুদ্র প্লাবন হ'তে রক্ষা করতে হ'লে তাহ'লে একজন অগস্ত্য মুনির দরকার বুঝি!

বিমল—আমি আশ্চর্য্য হলাম, এ কি ঠাট্টা-তামাসার বিষয়, না রঙ্গরসের সময়?

এই বালিকা সমাজ-রক্ষার জন্য আপনার জীবনটা এমন করে উৎসর্গ করলে, এতেও কি সমাজের চৈতন্য হবে না? পণ-রাক্ষসীকে কি সমাজ এর পরেও আপনার বুকে ক'রে রাখ্‌বে?

সম্পাদক—নিন্দাবাদের দ্বারা কি কেউ কখনও মারা যায়, রাক্ষসী তো দূরের কথা? বিষয়টা একবার তলিয়ে দেখ না কেন?

বিমল—আর মশায়, আপনার এই তলিয়ে দেখার জ্বালায় অস্থির হয়েছি। Righteous indignation ও moral enthusiasmকে নষ্ট করবার এই আচ্ছা এক ফন্দী বের করেছেন, এদিকে তলিয়ে তলিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে দেশটা তলিয়ে গেল।

সম্পাদক—আচ্ছা, তলিয়ে দেখার প্রয়োজন নাই। কি করে এই রাক্ষসীর হত্যার ব্যবস্থা করা যায়, বল দেখি?

বিমল—সভা করুন। বিবাহোপযুক্ত যুবকদের অন্তরে এই পণপ্রথার বিরুদ্ধে গভীর ঘৃণার উদ্রেক করুন। যে পণ নিয়ে বিয়ে কর্ব্বে, সমাজে তাকে হীন ও হেয় ক'রে তুলুন। লোকমত গঠন করুন। ছেলেদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞাপত্র সই করিয়ে নিন্। এই তো তার সময় ও সুযোগ। স্নেহলতার মৃত্যুতে দেশ শোকাচ্ছন্ন হয়েছে। যুবকদলের conscience জেগেছে। এ সময় একটা Anti-Dowry League গড়ে তুলে, পণ-রাক্ষসীকে বিনাশ করা সহজ হবে।

সম্পাদক—বেশ কথা। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলেই কি মানুষ সে প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পারে? সংকল্পের পশ্চাতে কি শক্তিসংযোগ না করলে, সে সংকল্প টিকিয়া থাকে?

বিমল—বলেন কি? যারা লেখা পড়া শিখেছে, তাদের মনের এটুকু জোর হবে না কি যে তারা যে সংকল্প কর্ব্বে, তা' প্রাণপণে রক্ষা কর্ব্বে?

সম্পাদক—লেখা পড়া শিখ্‌লেই কি মানুষ প্রকৃতির বিধানকে ইচ্ছামত উলটপালট করে দিতে পারে?

বিমল—পণ প্রথাটা কি তবে, আপনি বলেন,—একটা প্রকৃতির বিধান?

সম্পাদক—প্রকৃতির বিধান না হউক, কিন্তু প্রকৃতির প্রতিশোধ যে, সে বিষয়ে কি আর কোনও সন্দেহ আছে?

বিমল—ঐ আবার আপনি হেঁয়ালী ধর্‌লেন। আপনার সঙ্গে কোনও serious বিষয়ের আলোচনা করা কঠিন। Patience রাখা দায় হ'য়ে পড়ে। ছেড়ে দিন। দেখ্‌ছি আপনি ঘোর re-actionary হয়ে পড়েছেন। যেটী যেমন আছে, তার চুলপ্রমাণ পরিবর্ত্তন আপনার সয় না।

সম্পাদক—বিমল, তোমার সবই ভাল; কোমল প্রাণ আছে, উদার লোকপ্রীতি আছে, একান্ত দেশহিতৈষণা আছে, বিশাল বিশ্বমানব-প্রেম আছে। কিন্তু, বাপু, কেবল ষ্টীমে জাহাজ বা গাড়ী চলে না, steer-wheel চাই। আর তুফানে যখন নৌকা পড়ে, তখন কাণ্ডারীকে impatient হলে চলে কি? আগে দিঙ্-নির্ণয়টা কি আবশ্যক নয়?

বিমল—আচ্ছা আমি মনুমেণ্টের উপরে patient হয়ে বস্‌ছি, আপনিই আগে, দিঙ্-নির্ণয়টা করুন।

সম্পাদক—অমন্ রাগ করলে চল্‌বে না। ধীর হয়ে, সংস্কারবর্জ্জিত হয়ে, এ বিষয়ে বা

শুনেছ, পড়েছ, শিখেছ, বলেছ, একটু কালের জন্য সে সব যতটা পার মন থেকে বের করে দিয়ে, যদি কথা কও, তবে আলোচনা করা যেতে পারে। নইলে, এ গজকচ্ছপের লড়াইয়ে উভয় পক্ষেরই কেবল শক্তিহানি ও সময় নষ্ট হবে বই তো নয়। তাতে কোনও লাভ নাই।

বিমল—আচ্ছা বলুন, আমি ধীর হয়ে শুনছি।

সম্পাদক—স্নেহলতার আত্মহত্যার কথা পড়েছি। আমিও তো ছেলেপিলের বাপ, আমার প্রাণে যে লাগে নাই, তাহা নয়, কিন্তু বল দেখি, এ বালিকাকে হত্যা কল্লে কে?

বিমল—এ তো সোজাই দেখা যাচ্ছে। এই নিষ্ঠুর, আততায়ী বরপণপ্রথাই তার হত্যাপরাধে অপরাধিনী নয় কি?

সম্পাদক—প্রথার তো আর হাত পা নাই। প্রথা কাউকে মারেও না, বাঁচায়ও না। প্রথাবিশেষের অনুগত হয়ে যারা চলে, তারাই মারে ও তারাই রাখে। এ ক্ষেত্রে তারা কারা?

বিমল—যারা এত টাকা পণ না পেলে ছেলের বিয়ে দেবে না, কোট্ করে বসেছিল, তারাই তো স্নেহলতাকে মেরেছে?

সম্পাদক—বেশ কথা। স্নেহলতার মা-বাপ তার জন্য যে পাত্র ঠিক করেছিলেন, সে পাত্রের মা-বাপ যদি এত টাকার দাবী না ক'রত, তা' হ'লে স্নেহলতাকে মা-বাপের ভিটে রক্ষা করবার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন দিতে হ'ত না। কথাটা বেশ বোঝা গেল।

বিমল—আর এই পণপ্রথা যদি না থাকত তা হলে তো বরের মা-বাপ টাকা চাইতে পারতো না। তবেই দেখুন, ফিরে আমার প্রথম জবাবেই এসে পড়তে হয়।

সম্পাদক—তা তো বটেই, কিন্তু মেয়ের মা-বাপ যদি কোথাও বরপণ না দিতেন বা না দেন, তা' হ'লে তো বরের মা-বাপ কোথাও টাকা চাইতে পারতেন না। এও তো ঠিক। টাকা তো সংসারের পৌণে ষোল আনার বেশী লোকে হামেষাই চায়, কিন্তু পায় কি? আর যেখানে পাবার আশা নাই, সেখানে কি কেউ কোট্ করে বসে থাকে? কন্যাপক্ষ পণ দেয় বলেই বরপক্ষ টাকা চায়। এরা যদি না দিত ওরাও ত চাইত না। এখন দেখ্ছ—বরপণের মূলটা কোন্ খানে? কে এর জন্য দায়ী?

বিমল—আপনি কেমন গোলমাল বাধাবার চেষ্টা কচ্ছেন। একটা জটিল sophistry গড়ে তুলছেন। বরপক্ষ যদি এত টাকা না চাইত, স্নেহলতা তা হলে আত্মহত্যা করত না। কন্যাপক্ষ টাকা না দিলে, বর তো তার জন্য বিষ খেয়ে মরত না? আসল কথাটাই তো এই, তোমরা টাকার চাপ দিলে বলে মেয়েটা আপনার হাতে আপনাকে বলি দিলে।

সম্পাদক—আচ্ছা, কন্যাপক্ষ যদি টাকা না দিতে পারে, কোনও বর তাতে মরতে যায় না কেন, বল দেখি?

বিমল—তার কি আর কনে জুটে না? আরো দশটা বিশটা মেয়ে এসে হাজির হবে এখন।

সম্পাদক—তবে এই দাঁড়াচ্ছে যে স্নেহলতার বাপ-মা সে বরটীর পণ দিতে পারলেন না, বা দেওয়া কঠিন হ'ল বলে সে বর তার জন্য পাওয়া গেল না। এই জন্যই সে আত্মহত্যা করেছে। তার কি বিনা টাকায়,

বা কম টাকায়, অন্য বর জুটতো না? তার এক জাতের, একই প্রকারের কৌলিন্য-মর্য্যাদার, বর আর বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজে ছিল না, এমন তো নয়। অনেক ছিল। ঐ বরেরও যেমন অনেক কনে জুটত, এই কনেরও তেমনি অনেক বর জুটত। তবে আত্মহত্যার প্রয়োজনটা এল কোথায়?

বিমল—বাপ-পিতামহের ভিটে উৎসন্ন যায়, ছোট ছোট ভাই বোনেরা পথে দাঁড়ায়, তার বরের পণ দিতে গিয়ে এমন সব হয়, আর মেয়েটা কি স্থির হয়ে থাকতে পারে? আপনাকে মেরে সে বাপ মায়ের মাথা রাখবার স্থানটা রক্ষা করলে।

সম্পাদক—কিন্তু আসল প্রশ্নটার উত্তর তুমি দিচ্ছ না। এই বরের সঙ্গে বিয়ে না হলে কি স্নেহলতার আর বিয়ে হতো না?

বিমল—হতে পার্ত্তো হয়ত, কিন্তু সব মা-বাপই তো সদ্বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, জামাতা চায়, মেয়েটী সৎপাত্রস্থ হয় ইহা কে না চায় বলুন। স্নেহলতার মা-বাপের দোষ কি?

সম্পাদক—সৎপাত্র কাকে বল্‌বে? প্রথমে বংশমর্য্যাদা, দ্বিতীয়—সুশীলতা, তৃতীয়—সুশিক্ষা;—এই তিন নিয়েই তো সৎ-পাত্রের সৃষ্টি হয়। আর এই গুণের অধিকারী পাত্র কি স্নেহলতার জন্য বাংলা দেশে এই একটী বই আর ছিল না?

বিমল—তার মা-বাপের সাম্‌নে যদি আর কেউ থাক্‌তো, তা' হ'লে, তাঁরা এই পাত্রটীকে পাবার জন্য ঘরবাড়ী বিক্রী করতে যেতেন কি?

সম্পাদক—তাঁরা যে তেমন পাত্র খুঁজে-ছিলেন, তা' তো মনে হয় না। তাঁরা কলিকাতায় থাকেন, সুতরাং খুব সম্ভবতঃ সহরের আশে পাশেই কন্যার বর খুঁজেছিলেন, বাহিরে পল্লীগ্রামে যান নাই। কেননা এই বরপণ-প্রথা সহরের সমাজে যতটা প্রবল হয়ে উঠেছে, পল্লীগ্রামে এখনও ততটা হয় নাই। তারপর, তাঁরা বি-এ-পাশ বর চাচ্ছিলেন, এই বর আইন-পড়া ছিল; উকীল, ডিপুটী, মুনসেফ হবার তার হয়ত আশা ছিল। যদি এর চাইতে কম "পাশের" বরে তাঁদের মন উঠত, তাহা হ'লে এত টাকা দিতে হ'ত না, এও কি সত্য নহে? একেবারে যে ইংরেজী জানে না, সামান্য বাংলা ও সংস্কৃত মাত্র পড়েছে, কিন্তু ভদ্রবংশের ব্রাহ্মণ সন্তান, যার সামান্য জমিজমা বা যজমানাদি আছে বলিয়া, গৃহস্থের মেকদারে একরূপ স্বচ্ছন্দেই সংসার চলে যেতে পারে এমনও সংস্থান আছে, ইচ্ছা করলে এরূপ বর সহজেই বিনা টাকায় বা সামান্য টাকায় পাওয়া যেত। কিন্তু স্নেহলতার মা-বাপের সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। তাঁরা এই রজত-প্রাধান্য সমাজ-আদর্শের প্রভাবে, পূর্ব্বপুরুষদিগের গরিবানা চাল ভুলিয়া গিয়াছিলেন, মেয়েকেও সেইরূপেই হয়ত শিক্ষা-দীক্ষা দিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামে গরিব ব্রাহ্মণ-পরিবারে বিবাহ হ'লে, মেয়েকে রাঁধতে বাড়তে হবে, ধান ভান্‌তে, চিড়ে কুটতে হবে, ঘরদোর লেপাপোছা করতে হবে, গাই-বাছুরের সেবা করতে হবে,—ঝি-বামুনের সেবা খেয়ে, নভেল পড়ে ও হারমোনিয়মে দুনিয়ার বেসুরগুলোকে দিনরাত জাগিয়ে তুলে, পাড়াপ্রতিবেশীর নিদ্রা ও শান্তিভঙ্গ করে, বিলাস-ভোগ করা সম্ভব হবে না,—এই ভয়েই আজকালকার বাপ-মায়েরা

বি-এ, এম্-এ, পাশ জামাতা খুঁজে বেড়ান। রোগের নিদান হলো এখানে। তোমরা নিজেরা ভোগ-সর্ব্বস্ব হয়ে পড়েছ, পুত্র-কন্যাগুলিকে বিলাস-বিমূঢ় ক'রে তুলছ; কাজেই এই বরপণ-প্রথা এমন প্রবল হয়েছে। তোমাদের প্রপিতামহী ও প্রমাতামহীরা যেমন সংযত, শ্রমসহিষ্ণু আত্মীয়কুটুম্ব-অতিথি অভ্যাগতের সেবাপটু ছিলেন, পঞ্চাশজন লোকের জন্য দশ ব্যঞ্জন ভাত রাঁধিয়া যাঁরা কখনও ক্লান্তি বোধ করেন নাই, খাটাতেই যারা আমোদ পেতেন, ব্রত-পার্ব্বণাদিতে যাঁদের জীবনের সকল সাধ মিটিত;—তোমাদের প্রপৌত্রী ও প্রদৌহিত্রী-দিগকে যদি আবার যথাসম্ভব সে শিক্ষা দিতে পার, তবে এ সমস্যার কতকটা মীমাংসা হবে। নইলে, দিন আস্‌ছে, যখন ঘরবাড়ী বিক্রী করেও বরপণ দিয়ে মেয়েব বিয়ে দিতে পারবে না। মেয়ে বিকুবে না।

বিমল—তবে কি এ'র কোনও প্রতীকার হবে না?

সম্পাদক—হবে না, একেবারে এমন কথা কি করে বলি? যে পথে এ সমস্যার মীমাংসা হবে, সমাজ আপনি সে পথে ধীরে ধীরে চলেছে। সমাজকে আজ আমরা জীব বল্‌তে আরম্ভ করেছি। Social Organism কথাটা এখন সকলই বলে। আপনাকে বাঁচাইয়া রাখ্‌বার জন্য উপযুক্ত পথ খুঁজে নেবার শক্তি জীবধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। এই উদ্ভাবিনী শক্তি সমাজ মাত্রেরই আছে। আমাদের সমাজও বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী একটা ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে আপনি করে নেবে। কিন্তু তোমাদের এই আন্দোলন-আলোচনা সে পথে যাচ্ছে না। রোগের নিদান নির্ণয় না করেই, তোমরা ঔষধের ব্যবস্থা করছ। এতে সুফল ফলা দূরের কথা, অনেক কুফলই ফলবার ভয় আছে।

বিজয়—এ রোগের মূলটা কোথায়?

সম্পাদক—দুই কারণে এই বরপণ-প্রথাটা সমাজে এমন প্রবল হ'য়ে উঠেছে। প্রথম কারণ আধুনিক শিক্ষার ও বিদেশীয় সামাজিক আদর্শের প্রভাবে আমাদের মধ্যে ভোগ-বিলাস ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে টাকার আদরের অত্যন্ত বৃদ্ধি। এই জন্যই দেখ, আমরা পাশ করা বর খুঁজে বেড়াই। এটাকে বিদ্যার আদর বলে ভুল করো না। অনেকের মুখেই ইংরেজী শিক্ষার নিন্দাবাদ শুনতে পাই, পাশ কর্‌লেই যে লোকে বিদ্বান্ হয় বা মানুষ হয়, এমন কেউ বলে না। এই পাশ-করা বর খোঁজার অর্থই টাকা উপার্জ্জনের ক্ষমতা খুঁজিয়া বেড়ান। এল্-এ পাশ-করা বর খুঁজি কেন? সে ক্রমে বি-এ পাশ করে বি-এল্ পাশ করে, এম্ এ পাশ করে, উকীল, মুনসেফ, ডিপুটী হয়ত হতে পার্ব্বে, এই লোভে। সে সহরে বাস করবে, পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাক্‌বে না। মেয়েটী ঝি, চাকর, বামুন, হয়ত গাড়ী ঘোড়া রেখে সুখে দিন কাটাতে পার্ব্বে। এই ভোগবিলাসটার প্রতি সমাজের লোভ অত্যন্ত বেড়ে পড়েছে। তাই ভদ্রগৃহস্থের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়েই আমরা তৃপ্ত হই না। আমরা চাকুরে চাই, সহুরে চাই। আগে জাতকুল চাইতাম। এখন জাত না ভাঙলেও, জাতের দাম আর নাই। কুল

করলেও কুলের মর্য্যাদা আর তেমন নাই। এখন সমাজে রজতপ্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে পাশ-করা-কৌলিন্যের সৃষ্টি হয়েছে। আর কুলীন বরেরা তো আগেও পণ নিতেন, সুতরাং নূতন মার্কার কুলীনেরা এখন পণ পাবে, এটা আর আশ্চর্য্য কি ?

বিমল—আগেকার কুলীনেরা মূর্খ ছিল, এখনকার শিক্ষিত ছেলেদের যদি কুলীনই বলেন, তারা তো মূর্খ নয়। তবে তারা আপনাদের এমন করে' বেচে খায় কেন ?

সম্পাদক—বাপু, কথাগুলো যদি একটু ওজন করে বল, তবে সকল আন্দোলন-আলোচনাতেই আমাদের দেশে এমন গোল-মাল বাধে না। আচ্ছা, এই যে বেচা কথা বল্লে, কথাটা কি ঠিক ? বেচা কাকে বলে, একবার ভেবে দেখেছ কি ? তোমরা ইকনমিক্‌স্ পড়ছ, কত শত ইকনমিক্‌সের তত্ত্ব আবিষ্কার করছ, কিন্তু বেচা কথাটার মানে জান না, আশ্চর্য্য কথা। বেচা-কেনা যে বস্তুতঃ জিনিষ নিয়া নয়, কেবল স্বত্ব লইয়া, এটা তো জান। কাপড়ওয়ালা কাপড় বেচে, মুদী চাল-ডাল বেচে, মেছুনী মাছ বেচে, জমিদার জমি বেচে, তেমনি কি মা বাপ ছেলে বেচে ? কাপড়ওয়ালার দোকানে যে কাপড় আছে, সে কাপড়ের উপরে তার একটা স্বত্ব আছে, এই স্বত্বটা আর কারো নাই। সে তার কাপড় যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারে ; নিজে পরতে পারে, পরকে দিতে পারে, ইঁদুর দিয়ে কাটাতে পারে, আগুন দিয়ে পোড়াতে পারে, জল দিয়ে পচাতে পারে;—যা খুসী, তা করতে পারে। এই যে যা-কিছু করতে পারার অধিকার, যে অধিকার কোনও বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে আর কোনও লোকের নাই, তা'কেই স্বত্ব বলে। আর এক ব্যক্তি যখন অপর ব্যক্তির নিকটে এই বস্তু বেচে, তখন টাকার বিনিময়ে সে এই নিজস্ব স্বত্বটী হস্তান্তর করে। তার যে যথেচ্ছ-ব্যবহারে অধিকার ছিল, সে অধিকারটী তখন ক্রেতার হয়। যে বস্তুর উপরে যার এই যথেচ্ছ-ব্যবহারের অধিকার নাই, সে সে বস্তু বেচিতে পারে না। Right of exclusive use কেই ইকনমিক্‌স্‌এ proprietory right বলে। আর কোনও বস্তুর বেচা মানেই এই exclusive right পরিত্যাগ করা, কেনা মানেই টাকা দিয়া ইহা অর্জ্জন করা। প্রাচীনকালে মেয়ে বিক্রী হ'ত। তখন মেয়ে পিতৃপরিবারে খেটে সেই পরিবারের ধনাগমের সাহায্য করত। মেয়ে তখন একটা ইকনমিক্ বস্তু ছিল। বিবাহের পরে সে স্বামীর পরিবারে যাইয়াও তাদের শ্রী-ভাণ্ডারকে বাড়াইয়া দিত। তখন কন্যার বিবাহে এক পরিবার হ'তে অন্য পরিবারে একটা ইকনমিক স্বত্ব হস্তান্তরিত হত। মেয়েরা তখন, ইকনমিক্‌স্-এর চক্ষে, ক্রীত-দাসীদেরই সমান ছিল। দাসদাসীরা যেমন এক পরিবার হতে অন্য পরিবারে হস্তান্তরিত হ'ত, অর্থাৎ দাসদাসীদের শ্রমের ও শ্রমলব্ধ ধনের উপরে তাদের প্রভুদের যেমন একটা নিজস্ব স্বত্ব ছিল, একটা right of exclusive use ছিল,—কন্যাদের শ্রমের ও শ্রমলব্ধ ধনের উপরেও প্রথমে তাদের পিতৃপরিবারের, আর বিবাহান্তে তাদের শ্বশুরপরিবারের সেই-রূপ একটা নিজস্ব স্বত্ব, বা right of

exclusive use ছিল। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, এমন সুসভ্য ইংরেজ-সমাজেও বিবাহান্তে স্ত্রীর সমুদয় স্বত্ব ও সম্পত্তি স্বামীতে যাইয়া অর্শিত। এখন নূতন আইন হইয়া, ইংরেজ-সমাজে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সম্পত্তি লাভ ও সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার জন্মিয়াছে। এখন মেয়েরা আর একটা ইকনমিক দ্রব্য নহেন। পুরাকালে সকল সমাজেই সেরূপ ছিল। তখন মেয়ে-বেচা কথাটা সার্থক ছিল। বিবাহের দ্বারা মেয়ের উপরে, ইকনমিক্সের অর্থে, পিতা মাতার যে স্বত্ব ছিল, সে স্বত্ব তার শ্বশুর-পরিবার কিনিয়া লইত। আমাদের দেশে আসুর বিবাহে এইরূপই হইত। এই আসুর বিবাহকেই ইংরেজিতে marriage by purchase বলে। কিন্তু এই আসুর বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়া যখন ব্রাহ্ম বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইল, তখন হইতেই প্রাচীন হিন্দুসমাজে কন্যারও ক্রীতদাসীত্ব ঘুচিয়া গেল। তখন হইতে স্ত্রীধনেরও প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু মেয়ে-বেচা-প্রথার মতন, ছেলে-বেচা-প্রথা কখনও ছিল বলিয়া কোনও স্মৃতিতে বলে না। মেয়েই গোত্রান্তরিতা হইত, এখনও হয়; ছেলে কোনও দিন বিবাহ করিয়া গোত্রান্তরভুক্ত হইত না, ও হয় না। সে যেখানে ছিল সেখানেই থাকে। তার স্বত্ব-স্বামিত্ব যেমন ছিল, তেমনি থাকে। কন্যাপণ দিয়া লোকে মেয়েকে আপনার পরিবারভুক্ত করিয়া লইত, বরপণ দিয়া কেউ তো জামাইকে আত্মপরিবারভুক্ত করে না ও করিতে পারে না। এখানে কোনও স্বত্ব হস্তান্তরিত হয় না। সুতরাং ইহাকে "আত্মবিক্রয়" "সেল" (sale) প্রভৃতি বলা, কথার অপব্যবহার নয় কি?

বিমল—আপনি দেখ্‌ছি তবে এই পণ-প্রথার খুবই সমর্থন করেন।

সম্পাদক—তোমাদের এই আন্দোলন-আস্ফালনের পোষকতা না করলেই কি পণ-প্রথার সমর্থন করা হয়? যাকে শোধন করতে যাচ্ছ, সে বস্তুটা কি, তার প্রকৃতিগত ধর্ম্ম কি, কোন্ মূল হইতে তার উৎপত্তি, কোন্ শক্তির উপরে তার স্থিতি, এগুলি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা কি আবশ্যক নয়? তোমরা যা চাও, তারই জন্য ধীর ভাবে, বিষয়টাকে বিশ্লেষণ করে দেখা চাই। কেবল একটা হুজুক জমিয়ে তো কাজ হবে না।

বিমল—কিসে কাজটা হয়, তাই বলুন না।

সম্পাদক—প্রথম এটা বুঝতে হবে যে, বিবাহ একটা সংস্কার বা sacrament—ইংরেজি কথাগুলো তোমরা বেশী জান ও বোঝ বলে, সংস্কৃত বা বাংলা শব্দেরও এরূপ অনুবাদ আজ কাল করতে হয়—হলেও, মূলে এটা ইকনমিক্‌স্-সংক্রান্ত সমস্যা। এর সঙ্গে আয়োজন ও প্রয়োজনের বা supply ও demandএর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই আয়োজন ও প্রয়োজনের পরস্পরের পরিমাণ অনুযায়ীই পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। যেখানে আয়োজন অল্প, প্রয়োজন বেশী, supply কম demand বেশী, সেখানেই জিনিষের দাম চড়িয়া যায়; যেখানে আয়োজন বেশী প্রয়োজন কম সেখানেই জিনিষের দামও কমিয়া যায়। যে বস্তু কেউ চায় না—তার কোনও দাম নাই; যে বস্তু এত বেশী যে সহজেই তাহা পাওয়া যায়, তার দাম অতি সামান্য; যে বস্তু

পাবার জন্য যত বেশী লোকে অত্যন্ত উৎসুক তার দাম তত বাড়িয়া যায়। কোনও সমাজে বিবাহযোগ্য বরের সংখ্যা অপেক্ষা যদি কন্যার সংখ্যা অত্যন্ত কম থাকে, তবে সেখানে পণ দিয়া কন্যা আনিতে হয়। কারণ সেখানে একটী উপযুক্ত পাত্রীর পাণিগ্রহণের জন্য দশটী উপযুক্ত পাত্র আসিয়া হাজির হয়। আবার কোনও সমাজে বরের সংখ্যা অপেক্ষা কন্যার সংখ্যা যদি বেশী হয়, তবে সেখানে একটী উপযুক্ত পাত্রের জন্য দশটী উপযুক্ত কন্যা আসিয়া হাজির হয়। তখন কাজেই পণ দিয়াও লোকে বর পাইবার জন্য ব্যগ্র হয়। আর এই দশজন কন্যাকর্ত্তার মধ্যে তখন একটা প্রতিযোগিতা দাঁড়াইয়া যায়। একজন একশত টাকা পণ দিতে রাজি হইলে, আর একজন দেড়শত দিতে চায়, তার উপরে আর একজন হয়ত সৎপাত্র ভাবিয়া তিনশত টাকা দিয়াও বরটীকে নিতে রাজি হয়। এইরূপে বরের পণ বাড়িয়া যায়। এটা একটা ইকনমিক্ নিয়মের অধীন; সুতরাং এখানে যতদিন এ ক্ষেত্রে আয়োজন ও প্রয়োজনের মধ্যে এই বৈষম্য থাকিবে,—যতদিন বিবাহার্থিনী কন্যার সংখ্যা উপযুক্ত বরের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী থাকিবে,—আর এই বৈষম্যের জন্য যতদিন কন্যাকর্ত্তাদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা থাকিবে, ততদিন এই বরপণপ্রথা নিবারণ করাও অসাধ্য। ছেলেবেলা দেখেছি ডাক্তারের দক্ষিণা দু'চার টাকা মাত্র ছিল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ঔষধপত্রও পাওয়া যাইত। এখনও পল্লীগ্রামে বোধ হয়, তাই আছে। কিন্তু কলিকাতা সহরে ডাক্তারের ফি কত বেড়েছে, দেখছ তো! আট, ষোল, বত্রিশ, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, শ', দু'শ, পাঁচ শ' পর্য্যন্ত হয়। এর মানে কি? ঐ আয়োজন ও প্রয়োজনের কথা। কলিকাতায় আজ যদি দু'শ নীলরতন সরকার বা দেড় শ' সুরেশ সর্ব্বাধিকারী জন্মায়—তাহা হইলে ডাক্তারের দক্ষিণা আবার দু'টাকা চার টাকায় নামিয়া আইসে। ডাক্তারের ফি দিতে না পেরে কত লোক মরে, তার খবর রাখ কি? উকীল ব্যারিষ্টারের ফি যোগাতে না পেরে, কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হয়, তাও তো জান। কিন্তু কৈ সে জন্যে তো তোমরা কখনও দু'দশটা সভা করে, নীলরতন সরকার বা সুরেশ সর্ব্বাধিকারীর, এস, পি, সিংহের বা ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর, বা রাসবিহারী ঘোষের রাক্ষসী ফি-প্রথার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন কর না? মা-বাপ বরপণ দিতে পারে না বলে কটা মেয়ে মরেছে, আর ডাক্তারের ফি দিতে পারে না বলে কত লোক মর্‌ছে, তা ভেবেছ কি? বরপণ দিতে গিয়ে ক'টা লোকের ভিটে মাটী উৎসন্ন যায়, আর উকীল-ব্যারিষ্টারের ফি দিতে পারে না বলেই বা কত শত শত লোক সর্ব্বস্ব হারায়, তাও কি ভেবেছ?

বিমল—রোগে চিকিৎসা না কর্‌লেও চলে, মৃত্যুর উপরে হাত তো আর নাই, যা হবার তাই হবে, ভেবে পড়ে থাকতে পারা যায়; কিম্বা মামলা-মোকদ্দমা না চালালেও চলে, ভগবান যদি সর্ব্বস্বান্ত করেন, কি করব। কিন্তু মেয়ের বিয়ে না দিলে তো চলে না।

সম্পাদক—ঐখানেই তো যত গোল। বাঁচা-মরা বিধাতার ইচ্ছা, সুতরাং ডাক্তার না ডেকে তাঁর উপরে নির্ভর করে পড়ে থাক্‌তে পার; ধন-দারিদ্র্য তাঁর ব্যবস্থা, সুতরাং উকীল-

ব্যারিষ্টারের ফি না দিয়েও, মোকদ্দমা যায় যাক্, থাকে থাক্,—বিধাতার হাতে সে ফলাফল ছেড়ে দিতে পার। কিন্তু বিয়েটা যে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ সে কথা ভুলে যাও কেন? টাকা না জুটলে ভাল ডাক্তার ডাক না, হাতুড়েকে দিয়েই মনকে প্রবোধ দিয়া থাক। টাকা না থাকলে বড় উকীল-ব্যারিষ্টার দিয়ে মোকদ্দমা চালাও না, যেমনটী পাও তেমনটীতেও কোনও রূপে সন্তুষ্ট থাক। মেয়ের বরের বেলা তা পার না কেন?

বিজয়—লোকে পারে না দেখ্‌ছি, কেন পারে না, বুঝি না।

সম্পাদক—একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পার। ডাক্তার না ডেকে মর্‌লে কেউ সমাজে নিন্দা করে না। উকীল-ব্যারিষ্টার না দিতে পেরে, ভিটেমাটী ছাড়া হলেও, সমাজ কিছু বলে না। কিন্তু মেয়ের বিয়ে না হলে, সমাজ নিন্দা করে। আর আমরা সমাজকে ভগবানের চাইতে বেশী ভয় ক'রে থাকি।

বিজয়—তবে উপায় কি?

সম্পাদক—উপায়, সমাজের মতিগতি পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করা। ছেলেদের হুজুগে মাতাইয়া 'পণ লইয়া বিবাহ করিব না', প্রতিজ্ঞা পড়ানো মিছে। বাপেদের যদি প্রতিজ্ঞা করাতে পার, মেয়ে অনূঢ়া থাকে থাক; ইংরেজি লেখাপড়ার হিসাবে, মূর্খপাত্রকে মেয়ে দিতে হয় দিব;—কিন্তু এক কপর্দ্দক বরপণ দিব না, তবে ক্রমে সমাজের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হতে পারে। তোমরা ছেলেদের যে প্রতিজ্ঞা পড়াচ্ছ, সে প্রতিজ্ঞার শক্তি আসবে কোথা হ'তে? ভিতর থেকে যতক্ষণ একটা প্রেরণা না পাওয়া যায়, ততক্ষণ কোনও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এখানে ছেলেদের ভিতরে কোন্ প্রেরণা আস্‌বার সম্ভাবনা? শুদ্ধ পণ না নিয়ে বিবাহ কর্‌ব, এর কোনও সত্য প্রেরণা সম্ভব নয়। এতে বিবাহের একটা উন্নত আদর্শের প্রেরণা পর্য্যন্ত থাকে না। পণ না নিলেই আদর্শ বিয়ে হয় না। এতে বরের কোনও দিকে কোনও আত্মচরিতার্থতা লাভের সম্ভাবনা নাই। পছন্দ না করে বিয়ে কর্ব্বো না, এ প্রতিজ্ঞায় একটা ভিতরের প্রেরণা আসা সম্ভব, এরূপ প্রতিজ্ঞা রাখা যায়। কন্যা বয়স্কা না হলে বিয়ে কর্‌ব না; বা কুলীনকন্যা নইলে বিয়ে কর্ব্বো না,—এ সকলেরও একটা প্রেরণা থাকা সম্ভব, কারণ এ সকল সংকল্পের অন্তরালে একটা না একটা স্বার্থ বা সুখ সাধনের ইচ্ছা লুকাইয়া থাকে। কিন্তু পণ না নিয়ে বিয়ে কর্‌ব এই প্রতিজ্ঞার পশ্চাতে কোনও প্রকারের স্বার্থ বা সুখের কথা নাই, কোনও লাভের আশা নাই। কেবল ক্ষতিরই আশঙ্কা আছে। এ অবস্থায় এরূপ সংকল্প রক্ষা করে কে? অন্যপক্ষে কনের মা-বাপ যদি এই প্রতিজ্ঞা করেন যে কোনও অবস্থাতেই পণ দিয়া বর আনব না, তবে সে সংকল্প স্বার্থের শক্তিতে আপনি প্রবল হ'য়ে উঠ্‌বে। দু'পাঁচ শ' পিতা-মাতা যদি এ সংকল্প করেন, তবে কন্যা অনূঢ়া থাক্‌লে সমাজে নিন্দা হবে, সে ভয়টাও কেটে যায়। কারণ এই দু'পাঁচ শ' কন্যার মধ্যে আপাততঃ হয়তঃ এক শ' দু'শর বিয়েই হবে না। আর সমাজে যদি দু'শ মেয়ে আইবুড়ো বা যমবরা হইয়া থাকে, তা হলে আর বিয়ে না হওয়াটা দুর্ভাগ্যের কথা হলেও অপযশের কথা হবে না। এই পথে যদি এ সমস্যার

মীমাংসা হয়। মোট কথা এই, যদি বরপণ-প্রথা নিবারণ করতে চাও, তার ক'টা উপায় আছে :—

(১) বরেরা যাহাতে নিজ নিজ বধূকে দেখিয়া শুনিয়া পছন্দ করিয়া নির্ব্বাচিত করিতে পারে, তার উপায় করিতে হইবে। বিদেশীয় সমাজে এই পথেই এ সকল সমস্যার যথাসম্ভব মীমাংসা হইয়াছে।

(২) কন্যারা আমরণ অনূঢ়া থাকিলেও, সমাজে নিন্দনীয় হইবে না ; এইভাবে সমাজের মত পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কৌলিন্যের প্রভাবের সময় তাহাই হইয়াছিল।

(৩) স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচলন ও যাহাতে প্রত্যেক বালিকা অন্তঃপুরচারিণী থাকিয়াও, উপযুক্ত জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, এমন কিছু কাজকর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে।

কথাগুলি, বাপু একটু ভেবে দেখবে কি ? রাত হয়েছে, আজ এখানেই তা হলে এ আলোচনাটা শেষ হোক।

শ্রীঃ—

নিমাই-চরিত্র

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

নকুল ব্রহ্মচারী ও প্রদ্যুম্ন মিশ্রের উপাখ্যান,
ছোট হরিদাসের দণ্ড ও প্রভুর প্রতি দামোদরের বাক্যদণ্ড প্রয়োগ।

গৌড়ে নকুল ব্রহ্মচারী নামক এক সন্ন্যাসী আবির্ভূত হইলেন। তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া গৌরেরই মত কখনও হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন, কখনও বা উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতেন। সাত্বিক লক্ষণ সকলই তাঁহার শরীরে আবির্ভূত হইত। গৌরেরই মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহ, গৌরেরই মত সদা প্রেমাবিষ্ট, সেই ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া লোকে মনে করিতে লাগিল, ভগবান গৌরচন্দ্র তাঁহার দেহে আবির্ভূত হইয়াছেন। দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছুটিল, এবং তাঁহার দর্শনে প্রেম লাভ করিয়া আসিতে লাগিল। শিবানন্দ সেন ব্রহ্মচারীর অলৌকিক কাহিনী শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য গমন করিলেন। সন্ন্যাসীকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে শিবানন্দ প্রথমেই তাঁহার সমীপে গমন না করিয়া দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "আমি গৌরের দাসানুদাস। যদি সত্যই প্রভু এই সন্ন্যাসীর দেহে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে নিকটে ডাকিয়া লইবেন। যদি সন্ন্যাসী আমাকে ডাকিয়া লইয়া আমার ইষ্ট-মন্ত্র আমাকে বলেন, তবেই জানিব, সত্যই ইঁহাতে চৈতন্যের আবেশ হইয়াছে।" অগণিত

নরনারী সন্ন্যাসীর আশ্রমসমীপে সমাগত। ব্রহ্মচারী তাঁহাদের সমক্ষে বলিলেন, "শিবানন্দ নামক একব্যক্তি দূরে অবস্থান করিতেছেন, তোমাদের কেহ যাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আন।" চারিদিকে লোক ছুটিল, এবং "শিবানন্দ নামে কে আছ, তোমাকে ব্রহ্মচারী ডাকিতেছেন" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। শিবানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট গমন করিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে ব্রহ্মচারী কহিলেন, "শিবানন্দ সন্দেহ করিয়াছ? তবে শোন—তোমার চারি অক্ষরাত্মক গৌর-গোপাল-মন্ত্র। এখন অবিশ্বাস ত্যাগ কর।" শিবানন্দ কৃতার্থ হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।

শ্রীকান্ত সেন নামে শিবানন্দের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে বড়ই অনুগ্রহ করিতেন। শ্রীকান্ত প্রভুর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া একাকী নীলাচলে চলিয়া যান। গৌর পরম সমাদরে তাঁহাকে নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন। দুই মাস অতীত হইলে গৌর শ্রীকান্তকে গৌড়ে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিয়া কহিলেন, "ভক্তগণকে বলিও, এবার তাঁহাদিগকে নীলাচলে আসিতে হইবে না। আমি নিজেই গৌড়ে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিব। শিবানন্দকে বলিও, এই পৌষমাসে একদিন আমি আচম্বিতে তাহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইব। জগদানন্দকে বলিও আমি তাহার গৃহেও ভোজন করিব।" শ্রীকান্ত গৌড়ে প্রত্যাগত হইয়া ভক্তগণকে এই সংবাদ প্রদান করিলে সকলেই উৎফুল্ল হইলেন; অদ্বৈতাচার্য্য, শিবানন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ উৎকণ্ঠিতান্তঃকরণে প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পৌষ মাস সমাগত হইল—শিবানন্দ জগদানন্দ প্রত্যহ প্রভুর জন্য ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গৌর আসিলেন না। উভয়ে মহাদুঃখিত হইলেন। এমন সময় প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী (নৃসিংহানন্দ) একদিন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রদ্যুম্ন গৌরের পরম ভক্ত। তিনি গৃহস্থ ছিলেন। গৌর যখন ব্রহ্মদেশ হইয়া বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন—তখন প্রভুর পথক্লেশ দূরীকরণোদ্দেশে তিনি প্রভুর সমস্ত পথ বাঁধাইয়া দিয়া পথের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ ও জলাশয় খনন করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। প্রদ্যুম্ন নৃসিংহের উপাসক ছিলেন বলিয়া গৌর আদর করিয়া তাঁহাকে নৃসিংহানন্দ বলিয়া ডাকিতেন। প্রদ্যুম্ন শিবানন্দের গৃহে উপস্থিত হইলে শিবানন্দ তাহাকে আশা-ভঙ্গের কাহিনী বিবৃত করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মচারী কহিলেন, "তোমরা নিশ্চিন্ত হও। আজি হইতে তৃতীয় দিনে আমি প্রভুকে তোমার গৃহে নিশ্চয় আনয়ন করিব।" বলিয়া ব্রহ্মচারী ধ্যানে বসিলেন। দ্বিতীয় দিন শিবানন্দকে কহিলেন "প্রভু পানিহাটী আসিয়াছেন; আগামী কল্য মধ্যাহ্নে তিনি তোমার গৃহে উপস্থিত হইবেন। তুমি ভোজনের সামগ্রী আনয়ন কর, আমি তাঁহার জন্য রন্ধন করিব।" ব্রহ্মচারী যাহা যাহা চাহিলেন, শিবানন্দ সকলই আনিয়া দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মচারী পাক করিতে বসিলেন। পাক-সমাপনান্তে জগন্নাথ দেব, শ্রীচৈতন্য ও স্বীয় ইষ্টদেব নৃসিংহের জন্য

পৃথক পৃথক ভোগ প্রস্তুত করিলেন। তিন জনকে ভোগ নিবেদন করিয়া ব্রহ্মচারী ধ্যানে বসিলেন। তখন তিনি ধ্যান নেত্রে দেখিতে পাইলেন, শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হইয়া তিন জনের ভোগই ভোজন করিয়া ফেলিলেন। আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন, "কি কর, কি কর" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। "জগন্নাথ ও তুমি এক বট, সুতরাং জগন্নাথের ভোগ তুমি খাইতে পার, কিন্তু নৃসিংহদেবের ভোগ খাইতেছ কি রূপে?" ভোজন সমাপন পূর্ব্বক চৈতন্য অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মচারীর রোদন শুনিয়া শিবানন্দ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রদ্যুম্নের নিকট গৌরের আবির্ভাব-বৃত্তান্ত শুনিয়া শিবানন্দের সম্যক প্রত্যয় হইল না; সন্দেহ হইল, প্রেমোন্মত্ত সন্ন্যাসী হয়ত প্রলাপ বকিতেছে।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে শিবানন্দ প্রভুকে দর্শন করিবার অভিলাষে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে গৌর বলিয়াছিলেন, "গত বৎসর পৌষ মাসে নৃসিংহ আমাকে যেরূপ ভোজন করাইয়াছিলেন, সেরূপ ভোজন আমি কোথাও করি নাই।" শুনিয়া শিবানন্দ স্বীয় অবিশ্বাসের জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন।

শিবানন্দের গৃহে আবির্ভূত হইয়া গৌর যেমন ভক্তদত্ত অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন, তেমনি প্রত্যহই শচীদেবীর গৃহে আবির্ভূত হইয়া জননীর স্নেহদত্ত অন্ন ভোজন করিতেন। প্রত্যহ শ্রীবাসাঙ্গনে আবির্ভূত হইয়া কীর্ত্তন দর্শন করিতেন। যাঁহারা বাস্তবিক প্রেমিক, তাঁহারাই তখন তাঁহার দর্শন লাভ করিতেন।

ভগবান আচার্য্য নামক একজন পরম পণ্ডিত ও বৈষ্ণব পুরুষোত্তমে গৌরের নিকট বাস করিতেন। গৌর মাঝে মাঝে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন। ভগবানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপনে বারাণসী ধামে বেদান্ত পাঠ সমাপ্ত করিয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। আচার্য্য ভ্রাতাকে প্রভুর নিকট লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। কিন্তু গৌর তাঁহার দর্শনে সুখ লাভ করিলেন না। আচার্য্যের মনে ইচ্ছা ছিল, প্রভুকে লইয়া একদিন ভ্রাতার বেদান্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। স্বরূপের নিকট এই ইচ্ছা একদিন ব্যক্ত করিলে স্বরূপ কহিলেন, "তোমার কি বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে যে, মায়াবাদ শুনিবার জন্য আগ্রহ জন্মিয়াছে।" আচার্য্য লজ্জায় মৌনী রহিলেন এবং অচিরেই ভ্রাতাকে দেশে প্রেরণ করিলেন।

ছোট হরিদাস গৌরের একজন কীর্ত্তনীয়া। তিনি গৌরের আবাসে অবস্থান করিতেন এবং সুমধুর কীর্ত্তন দ্বারা প্রভুর চিত্ত বিনোদন করিতেন। গৌর তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। এক দিন ভগবান আচার্য্য গৌরকে স্বীয় গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া ছোট হরিদাসকে কহিলেন, "হরিদাস, শিখি মাইতীর ভগিনী মাধবী দেবীর নিকট যাইয়া তুমি আমার নাম করিয়া একমণ উৎকৃষ্ট চাউল লইয়া আইস।" মাধবী দেবী বৃদ্ধা ও পরম বৈষ্ণবী ছিলেন। হরিদাস প্রভুর জন্য চাউল-সংগ্রহার্থ তথায় গমন করিলেন এবং চাউল আনিয়া আচার্য্যকে প্রদান করিলেন। যথাকালে আসিয়া গৌর ভোজনে বসিলেন। উৎকৃষ্ট চাউলের অন্ন দেখিয়া গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন

"এমন চাউল কোথায় পাইলে ?" আচার্য্য কহিলেন, "মাধবী দেবীর নিকট হইতে আনাইয়াছি।" গৌর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আনিতে গিয়াছিল ?" আচার্য্য ছোট হরিদাসের নাম করিলেন। গৌর তখন আর কিছু বলিলেন না; কিন্তু ভোজনান্তে আবাসে প্রত্যাগত হইয়া গোবিন্দকে কহিলেন, "আজি হইতে ছোট হরিদাসকে আর এখানে আসিতে দিও না।" প্রভুর ক্রোধের কথা হরিদাসের কর্ণগোচর হইল। হরিদাস মনো-দুঃখে তিন দিন উপবাসী রহিলেন। ভক্তগণ ক্রোধের কারণ বুঝিতে না পারিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, হরিদাস তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছে ?" গৌর কহিলেন, "যে বৈরাগী হইয়া প্রকৃতি সম্ভাষণ করে, আমি তাহার মুখদর্শন করিতে পারি না।

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ
দারু প্রভৃতি হরে মুনি জনের মন।
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া।

এই কথা বলিয়া গৌর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে ভক্তগণ সকলে মিলিত হইয়া হরিদাসের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। গৌর রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তোমরা নিজকার্য্যে মন দেও। পুনরায় আমাকে উহার সম্বন্ধে যদি তোমরা কিছু বল, তাহা হইলে আর আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না।" ভক্তগণ দুঃখিত হইয়া উঠিয়া গেলেন। ইহার কিছুদিন পরে সকলে পরমানন্দ পুরীর নিকট গমন করিয়া গৌরকে প্রসন্ন করিতে অনুরোধ করিলেন। পুরী একাকী গৌরের নিকট গমন করিলেন। গৌর তাঁহাকে যথারীতি অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু পুরী হরিদাসের কথা উত্থাপন মাত্র কহিলেন, "আপনি সমস্ত বৈষ্ণব লইয়া এখানে অবস্থান করুন, আমি আলালনাথে চলিয়া যাই" বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। পুরী অনেক অনুনয় করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

হরিদাসের আশা ভরসা নির্মূল হইল। ভক্তগণের মনে মহাত্রাসের সঞ্চার হইল। সকলে প্রাণপণে স্ত্রীলোকের চিন্তা মন হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক বৎসর যাবৎ কেবল দূর হইতে প্রভুকে দর্শন করিয়া হরিদাস পিপাসিত নয়নকে কৃতার্থ করিলেন। কিন্তু কালে কষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিল। যাঁহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন, এক বৎসর যাবৎ নিকটে থাকিয়াও হরিদাস তাহা হইতে লক্ষ যোজন দূরে বোধ করিতে লাগিলেন। যাঁহার প্রেম জীবনের সম্বল করিয়া হরিদাস সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, একবৎসর যাবৎ সে প্রেমে তিনি বঞ্চিত রহিলেন। পূজার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল, কিন্তু দেবতা ত তাহার প্রেমের আকাঙ্ক্ষী নহেন, তিনি প্রস্তরের মতই এক বৎসর যাবৎ নিশ্চল ও নির্ব্বিকার হইয়া রহিলেন। আকাঙ্ক্ষার তীব্র জ্বালা নিয়ত হরিদাসকে পীড়িত করিতে লাগিল। অবশেষে একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া হরিদাস নীলাচল ত্যাগ করিলেন। প্রয়াগে ত্রিবেণী সমীপে প্রভুপদপ্রাপ্তি সংকল্প করিয়া হরিদাস আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। দেহ-বন্ধন বিমুক্ত হরিদাস দিব্যদেহে আরাধ্য দেবতার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন আর ক্রোধ নাই,

নিষেধও নাই। ভক্তবৎসল তখন স্বীয় ভক্তকে কৃপা করিলেন। প্রিয়ভৃত্য তখন অলক্ষিতে প্রভুর সন্নিধানে অবস্থিতি করিয়া রজনীযোগে প্রভুকে পূর্ব্বেরই মত কীর্ত্তন শুনাইতে লাগিলেন। একদিন গৌর প্রকাশ্যে ভক্তগণকে কহিলেন, "হরিদাস কোথায়, তাহাকে ডাকিয়া আন।" ভক্তগণ কহিলেন, "তোমার বিরহে অধীর হইয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আমরা জানি না।" গৌর উত্তর করিলেন না।

একদিন জগদানন্দ, স্বরূপ ও মুকুন্দ সমুদ্র স্নানে গমন করিয়াছেন। দূর হইতে তরঙ্গ কল্লোল ভেদ করিয়া হরিদাসের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর তাঁহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহারা চতুর্দ্দিকে চাহিলেন, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কিন্তু সেই দূরাগত সঙ্গীত তাহাদিগের কর্ণে সুধাবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে প্রয়াগাগত এক বৈষ্ণবের নিকট শ্রীবাসাদি ভক্তগণ হরিদাসের আত্ম-বিসর্জ্জন-সংবাদ অবগত হইলেন। বৎসরান্তে নীলাচলে আসিয়া শ্রীবাস জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, হরিদাস কোথায়?" গৌর গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "স্বকর্ম্মফলভাক্ পুমান্।"

পুরুষোত্তমে এক পরমসুন্দর ব্রাহ্মণকুমার প্রত্যহ গৌরের নিকট আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যাইত। গৌর তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। ব্রাহ্মণকুমার এক পরম রূপবতী বিধবার সন্তান। তাহার প্রতি গৌরের অত্যধিক স্নেহ লক্ষ্য করিয়া পাছে লোকে প্রভুর কলঙ্ক রটনা করে, এই ভাবিয়া দামোদর সেই ব্রাহ্মণকুমারকে দেখিলেই বিরক্ত হইতেন। তাহাকে আসিতে তিনি বারংবার নিষেধ করিলেন, কিন্তু বালক গৌরকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। গৌরের স্নেহও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একদিন নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া দামোদর প্রভুকে কহিলেন, "অন্যকে উপদেশ দিবার বেলায় গোসাঞি মহাপণ্ডিত, কিন্তু নিজের বেলায় গোসাঞি কেমন, তাহা এবার বুঝিব।" গৌর ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে দামোদর কহিলেন, "তুমি স্বাধীন, কে তোমার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে? কিন্তু মুখর জগতের মুখ ত আর বন্ধ করিতে পারিবে না। বিচার করিয়া দেখ দেখি, সুন্দরী বিধবার পুত্রকে এত স্নেহ করিলে লোকে কাণাকাণি করিবে না কি? সত্য বটে সে বিধবা সতী, সত্য বটে তিনি তপস্বিনী; কিন্তু তিনি যে সৌন্দর্য্যরূপ মহাদোষে দূষিত।" গৌর দামোদরের স্পষ্ট বাক্যে প্রীত হইলেন।

ইহার কিছুকাল পরে গৌর দামোদরকে কহিলেন, "দামোদর, তোমার মত বন্ধু আমার কেহ নাই। আমার ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সেদিন নিরপেক্ষভাবে আমাকে যাহা বলিয়াছিলে, তাহাতে আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, এবং মনে ভাবিয়া দেখিয়াছি, তুমিই আমার মাতার উপযুক্ত রক্ষক। তুমি নবদ্বীপে যাও, এবং আমার মাতার নিকটে গিয়া থাক। মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইও।" দামোদর সম্মত হইলেন। তখন মাতাকে বলিবার জন্য অনেক স্নেহ-পূর্ণ কথা তিনি দামোদরকে বলিয়া দিলেন। গৌর কহিলেন, "মাতার চরণে আমার কোটী কোটী নমস্কার জানাইয়া তাহাকে বলিও, তাঁহার সেবা করিবার জন্যই আমি তোমাকে পাঠাইতেছি। আরও বলিও, তাঁহার আহ্বানে আমি কত-বার গৃহে যাইয়া তাঁহার প্রস্তুত মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন

ভোজন করিয়া আসিয়াছি। এই মাঘ সংক্রান্তিতে শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্য নানা-প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া যখন আমাকে স্মরণ করিয়া তাহার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল, তখনও আমি গিয়া সকলই খাইয়া আসিয়াছিলাম। তিনি স্বপ্নে আমার ভোজন-বৃত্তান্ত সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু জাগ্রদবস্থায় ভ্রান্তিবশে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার আজ্ঞাতেই আমি নীলাচলে বাস করিতেছি ; তাঁহার আকর্ষণে আমি বার-বার যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেছি। স্থূল শরীরে দূরে থাকিলেও, সূক্ষ্ম শরীরে আমি নিয়তই তাঁহার নিকটে আছি।" মাতার জন্য মহাপ্রসাদ দিয়া গৌর দামোদরকে বিদায় দিলেন। দামোদর নবদ্বীপে আসিয়া শচী-মাতার সেবা করিতে লাগিলেন।

একদিন প্রদ্যুম্ন মিশ্র গৌরকে কহিলেন, "প্রভু, আমি অধম সংসারী হইয়াও তোমার চরণ লাভ করিয়াছি ; এখন দয়া করিয়া যদি আমাকে কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দান কর, তবে কৃতার্থ হই।" তখন গৌর রামানন্দের গুণ জগতে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে কহিলেন, "কৃষ্ণ-কথা শুনিবার জন্য যদি তোমার আগ্রহ হইয়া থাকে, রামানন্দ রায়ের নিকট যাও।" গৃহস্থ হইয়াও রামানন্দ রিপু দমন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছিলেন—গৃহস্থ হইয়াও তিনি সন্ন্যাসী অপেক্ষা সংসারে অধিক নির্লিপ্ত ছিলেন। তাই গৌর প্রদ্যুম্নকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। এই কার্য্যে গৌরের আরও একটী উদ্দেশ্য ছিল। সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণের সর্ব্বনাশ করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি শূদ্রদ্বারা ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ; হরিদাস দ্বারা নামমাহাত্ম্য, সনাতন দ্বারা ভক্তি-সিদ্ধান্ত এবং রূপ দ্বারা রাসপ্রেমলীলা প্রচার করিয়াছিলেন। সেই একই উদ্দেশ্যে আজ তিনি প্রদ্যুম্নকে রামানন্দ রায়ের নিকট পাঠাইলেন। প্রদ্যুম্ন রামানন্দ রায়ের গৃহে গমন করিয়া বহুক্ষণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহার দর্শন পাইলেন না। ভৃত্যের নিকট শুনিলেন তিনি দুইটী পরমা-সুন্দরী নৃত্যগীতনিপুণা কিশোরীকে নিভৃত উদ্যানে স্বরচিত নাটকের অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন। শুনিয়া রামানন্দের উপর মিশ্রের অভক্তির উদ্রেক হইল। বহুক্ষণ পরে রামা-নন্দ আসিলেন এবং বিলম্বের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মিশ্র বিরক্তি গোপন করিয়া কহিলেন, "এই আপনাকে দেখিতে আসিয়া-ছিলাম," প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন না। রামানন্দ-গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মিশ্র প্রভু সমীপে গমন করিলেন এবং স্বীয় সংশয়ের কথা তাঁহাকে অবগত করিলেন। শুনিয়া গৌর কহিলেন, "আমি সন্ন্যাসী ; সংসার বিরত বলিয়া আমার অভিমান আছে ; কিন্তু দর্শন ত দূরের কথা, যুবতীর নাম শুনিলেও আমার শরীরে ও মনে বিকার উপস্থিত হয়। কিন্তু রামানন্দ তরুণীর স্পর্শেও নির্ব্বিকার, তিনি স্বহস্তে সুন্দরী দেবদাসীর সেবা করেন ; স্বহস্তে তাহাদিগকে স্নান করাইয়া ভূষণ পরাইয়া দেন, তবু তিনি নির্ব্বিকার। কোথায় কেমন করিয়া নাচিতে হইবে, কোথায় সাত্ত্বিকী, কোথায় সঞ্চারী ও কোথায় স্থায়ী ভাবের অভিনয় করিতে হইবে, নিজে

নাচিয়া ও অভিনয় করিয়া তাহা তিনি যুবতী-দিগকে শিক্ষা দেন; কিন্তু তাঁহার মন পাষাণের মত নির্ব্বিকার। তাঁহার দেহ প্রাকৃত নহে; তাঁহার ভজন রাগানুগ-মার্গানু-সারী। তোমার যদি কৃষ্ণ-কথা শুনিতে বাস্তবিকই আগ্রহ হইয়া থাকে—সন্দেহ না করিয়া তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাও; তাঁহাকে বলিও, আমিই তোমাকে পাঠাইয়াছি।"

মিশ্র পুনরায় রামানন্দ-ভবনে গমন করিয়া প্রভুর আদেশ ব্যক্ত করিলেন। তখন রামা-নন্দ কৃষ্ণ-কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিন প্রহর গত হইল, বক্তা ও শ্রোতা কাহারও বিরক্তি নাই, দিবা অবসান প্রায় হইয়া আসিল, উভয়েই কৃষ্ণরসে আত্মবিস্মৃত। একজন ভৃত্য আসিয়া সন্ধ্যা-সমাগম সংবাদ দিয়া গেল, তখন বাহ্যজ্ঞান হইল। মিশ্র কৃতার্থ হইয়া গৃহে গমন করিলেন। সন্ধ্যা কালে প্রভু-সমীপে গমন করিয়া মিশ্র কহিলেন, "প্রভু, তোমার সেবক কৃতার্থ হইয়া আসিয়াছে। রামানন্দ মানুষ নহেন; তিনি কৃষ্ণভক্তিরসে গঠিত। তিনি আমাকে কহিলেন, আমাকে কৃষ্ণ-কথা বক্তা বলিয়া জ্ঞান করিও না। গৌরচন্দ্রই আমার মুখে কথা কহিতেছেন।" গৌর কহিলেন, "রামানন্দ অনন্ত বিনয়ের আধার; তাই স্বকীয় ক্ষমতা আমাতে আরোপ করিয়াছেন।"

শ্রীতারক চন্দ্র রায়।

চন্দ্রের জন্ম-কথা

আমাদের চন্দ্রের সকলই অদ্ভুত। নিজের মুখখানির সর্ব্বাংশ সে মাসে একবারের অধিক দেখায় না; দিনে দিনে পলে পলে তাহার ক্ষয়বৃদ্ধি চলে। ইহার পরে যদি তাহার গতিবিধি সাদাসিধে রকমের হইত তাহা হইলে বাঁচা যাইত; কিন্তু চন্দ্র সরল পথে আকাশ-মার্গে চলিতে পারে না; এমন কুটিল গতি বোধ হয় আর কোন জ্যোতিষ্কেরই নাই। আকারের পরিমাণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও এক সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার দেখা যায়। সৌরজগতে যতগুলি উপগ্রহ আছে, তাহাদের মধ্যে শনির উপগ্রহ টাইটান্ই (Titan) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, কিন্তু শনি-দেহের তুলনায় টাইটান্ খুবই ছোট। হিসাব করিলে দেখা যায় ৪৬০০ শত টাইটান্ জড় না হইলে একটি শনি-গ্রহের গঠন করিতে পারেন না। কিন্তু আমাদের চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ হইয়া, পৃথিবীর আয়তনেরই প্রায় সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিসাব করিলে দেখা যায়, আটটি চন্দ্র জোড়া দিলেই পৃথিবীর মত গ্রহ উৎপন্ন করা যাইতে পারে। নিজের উপগ্রহ অপেক্ষা গুরুত্বে কেবলমাত্র আটগুণ অধিক, এ প্রকার গ্রহ সৌরজগতে নাই।

যাহা হউক, পৃথিবী ও চন্দ্রের আয়তনের এই অল্প পার্থক্য চন্দ্রের জন্মতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা কথার অবতারণা করিয়াছে। বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহদিগের উপগ্রহগণ যে প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছিল, আমাদের চন্দ্রের উৎপত্তি

সে প্রকারে হয় নাই বলিয়া আধুনিক জ্যোতিষিগণ বিশ্বাস করিতেছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সকল কথারই ব্যাখ্যান এখনো লাপ্লাসের নীহারিকাবাদের সাহায্যে দেওয়া হইয়া থাকে। উপগ্রহদিগের জন্ম রহস্য জানিবার জন্য নীহারিকাবাদীদের শরণাপন্ন হইলে তাঁহারা বলেন, এই যে চন্দ্র প্রভৃতি উপগ্রহ দেখিতেছ, ইহারা প্রথমে তাহাদের আশ্রিত গ্রহদেরই শরীরে লীন ছিল। এই অবস্থায় গ্রহগণ জমাট্ বাঁধে নাই; তাহাদের জ্বলন্ত বাষ্পময় দেহ প্রচণ্ড বেগে আবর্ত্তিত হইতে হইতে কেবল সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল মাত্র! কোন জিনিষ দো-টানার মধ্যে পড়িলে, বিপদ উপস্থিত হয়। গ্রহগণকে এই অবস্থায় সত্যই দো টানার মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল, প্রথম শীতল হাওয়ার জন্য আকুঞ্চনের টান্, দ্বিতীয় আবর্ত্তন গতির জন্য প্রসারিত হইবার টান্। নীহারিকাবাদীরা বলেন, ইহার ফলে গ্রহগণ নিজের সুদূর-বিস্তৃত বায়ব-দেহগুলিকে সম্পূর্ণ গুটাইয়া দলা পাকাইতে পারে নাই, দেহের কতক অংশ বলয়াকারে মাঝ-পথে ফেলিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল। নীহারিকাবাদের মতে এই প্রকার বলয়াকারে পরিত্যক্ত সামগ্রীরাশি পরে জমাট বাঁধিয়া উপগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে।

আধুনিক অনেক জ্যোতিষী বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অপর গ্রহদের উপগ্রহগুলি হয়ত পূর্ব্বোক্ত ধারায় উৎপন্ন হইয়া থাকিবে, কিন্তু আমাদের চন্দ্রের জন্ম কখনই ঐ প্রথায় হয় নাই। ইঁহারা তাহার জন্মের একটা পৃথক্ প্রকরণ দেখাইতেছেন। পৃথিবীর বাষ্পময় দেহ হইতে চন্দ্র জন্মে নাই, পৃথিবীর জমাট দেহ হইতে জমাট অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হইয়াই চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, ইহাই তাঁহাদের মত।

সূর্য্য পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে সত্য, কিন্তু সূর্য্যের প্রভাব হইতে পৃথিবী মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। সূর্য্যের টানে পৃথিবীর শিলা-মৃত্তিকা স্থানচ্যুত হয় না বটে, কিন্তু সমুদ্রের জল সেই টান সহ্য করিতে পারে না। আমাদের সমুদ্রগুলিতে এবং সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নদীতে প্রতিদিনই যে জোয়ার-ভাটা হয়, তাহা সূর্য্যের আকর্ষণেরই ফল প্রকাশ করে। কেবল সূর্য্য নয়, আমাদের চন্দ্রটিও সমুদ্রের জল টানিয়া উঁচু করিতে ছাড়ে না। আধুনিক জ্যোতিষিগণ বলিতেছেন পৃথিবীর সর্ব্বাংশ যখন তরল পদার্থে আচ্ছাদিত ছিল, তখন সূর্য্যের আকর্ষণে পৃথিবীতে অতি প্রবল ভাবে জোয়ার-ভাটা চলিত। এই জোয়ার-ভাটা হইতেই চন্দ্রের উৎপত্তি। ইঁহারা আরো বলিতেছেন, সূর্য্যের টানে পৃথিবীর দেহের কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া চন্দ্রের উৎপত্তি করিলে, তাহা একেবারে ২,৪০,০০০ মাইল দূরে গিয়া আধুনিক চন্দ্রের আকার প্রাপ্ত হয় নাই। জন্মের পরে চন্দ্র পৃথিবীর খুব নিকটেই থাকিত এবং পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া তাহাতে প্রবল জোয়ার-ভাটা উৎপত্তি করিত ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেও পৃথিবীর টানে বিচলিত হইত। আধুনিক জ্যোতিষিগণের মতে, এই জোয়ার-ভাটাই চন্দ্রটিকে পৃথিবীর কোল হইতে টানিয়া লইয়া দূরে ফেলিয়াছে এবং তাহার আকৃতি-প্রকৃতি ও গতিবিধি এত জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

জ্যোতিষিগণ কি প্রকারে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার আভাস দিবার পূর্ব্বে, দুইটি সুপরিচিত ব্যাপারের উল্লেখ প্রয়োজন। যখন জাঁতা বা কোন চাকা প্রবল বেগে আবর্ত্তন করিতে থাকে, তখন তাহার উপরে হাত রাখিলে আবর্ত্তন-বেগ কমিয়া আসে। কারণ এ স্থলে জাঁতার চেষ্টা হয় আবর্ত্তন করা এবং তাহার উপরিস্থ হাত খানির কাজ হয় আবর্ত্তনে বাধা দেওয়া, কাজেই ইহাতে আবর্ত্তন-গতিই কমিয়া আসে। আবর্ত্তন-শীল পৃথিবীর উপরে যখন জোয়ারের জল উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তখন তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পৃথিবীর আবর্ত্তন বেগ হ্রাস করিয়া আনিবে, মনে করা স্বাভাবিক। চান্দ্র-রহস্যের সমাধানে জ্যোতিষিগণ এই ব্যাপারটি হিসাবের মধ্যে আনিয়াছেন। ক্রিয়া থাকিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে সম-পরিমাণে প্রতিক্রিয়া আছে, ইহা একটা ধ্রুব গাণিতিক সত্য। কাজেই সদ্যোজাত চন্দ্র যখন প্রবলভাবে পৃথিবীর তরল বা কোমল দেহের উপরে জোয়ার-ভাটা খেলাইতেছিল, তখন পৃথিবী যে চন্দ্রের উপরে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখায় নাই, ইহা কখনই স্বীকার করা যায় না। জ্যোতিষিগণ এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটাও গণনার মধ্যে আনিয়াছেন এবং অতীতকালে চন্দ্রের উপরে এই সকল শক্তি তাহার গতিবিধি এবং আকৃতি-প্রকৃতির উপরে কি প্রকার কার্য্য করিয়াছিল তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। অভিব্যক্তির সূত্র খুঁজিতে গেলে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে ভুলিয়া অতীতের দিকে দৃষ্টি দিলেই সাফল্য লাভ করা যায়।

যাহা হউক, এখনকার চন্দ্রের কথা স্মরণ করিলে দেখা যায়, ইহা পৃথিবী হইতে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে থাকিয়া সাতাশ দিনে এক একবার পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসিতেছে এবং এই সময়ে সে নিজের মেরুদণ্ডের (axis) চারিদিকে লাট্টুর মত কেবল একবারমাত্র ঘুরপাক্ দিতেছে। চন্দ্রের প্রদক্ষিণকাল এবং আবর্ত্তনকাল একই বলিয়া উহার একটা পিঠই পৃথিবীর দিকে উন্মুক্ত থাকে; অপর পিঠে কোথায় কোন্ পর্ব্বত কোন্ গুহা আছে আমরা তাহা দেখিতেই পাই না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি চন্দ্র জন্ম-গ্রহণ করিবামাত্র ভূ-পৃষ্ঠের তরল পদার্থে জোয়ার-ভাটা খেলাইয়া পৃথিবীর আবর্ত্তন-বেগ কমাইয়াই আসিতেছে। সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, বহুকাল জোয়ার-ভাটার বাধা পাইয়া এখন পৃথিবী যেমন চব্বিশ ঘণ্টাকালে নিজের মেরু-দণ্ডের চারিদিকে পূর্ণাবর্ত্তন দিয়া দিন-রাত্রির লীলা দেখাইতেছে, অতি প্রাচীন-কালে তাহা দেখাইত না; তখন পৃথিবীর উপরে জোয়ার-ভাটার বাধা নূতন আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র, কাজেই পৃথিবীর আবর্ত্তন-বেগ এতটা কমিয়া দিন-রাত্রিকে এখনকার মত দীর্ঘ করিতে পারে নাই। সুতরাং মানিয়া লইতে হইতেছে, অতি প্রাচীন-কালে আমাদের দিবারাত্রিগুলা হয়ত ২২ ঘণ্টা, ২০ ঘণ্টা বা তাহারও ছোট ছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রত্যেক ক্রিয়ার এক একটা প্রতিক্রিয়া থাকে। কাজেই চাঁদ যেমন পৃথিবীতে জোয়ার খেলাইয়া তাহার আবর্ত্তন-বেগ কমাইয়াছে, পৃথিবীও তেমনি চাঁদের উপরে কার্য্য করিয়া

তাহার প্রদক্ষিণ-কাল বাড়াইতে বাড়াইতে এখন সাতাশ দিনে দাঁড় করাইয়াছে, ইহাও অনুমান করা যায়। সুতরাং মানিয়া লইতে হইতেছে, অতি প্রাচীনকালে আমাদের দিবা-রাত্রির আয়ু যেমন অল্প ছিল, চান্দ্র মাস অর্থাৎ চন্দ্রের পৃথিবী-প্রদক্ষিণের কালও তেমনি ছোট ছিল।

জমার কোঠার অঙ্ক এবং খরচের কোঠার অঙ্ক যদি ঠিক সমপরিমাণে কমিয়া আসে, তবে খরচের অন্তে জমার টাকার পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যায় না। সুতরাং পৃথিবীর দিন-রাত্রির পরিমাণ হ্রাস এবং চন্দ্রের প্রদক্ষিণ-কাল হ্রাস, যদি ঠিক্ তালে তালে চলিয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তবে স্বীকার করিতেই হয় প্রাচীনকালে ঠিক্ এখনকার মতই সাতাশ দিনে এক চান্দ্রমাস পূর্ণ হইত; পার্থক্যের মধ্যে তখনকার দিন ও মাস উভয়ই এখনকার তুলনায় ছোট ছিল মাত্র। কিন্তু গণিতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের গণনা হইতে দেখা যায়, পৃথিবীর আবর্ত্তনকাল এবং চন্দ্রের প্রদক্ষিণ ঠিক তালে তালে কমিতে পারে নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত যে সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধান রহিয়াছে, তাহাতে আমাদের পৃথিবীর দিনগুলা যে প্রকার শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া চলিয়াছে, চন্দ্রের প্রদক্ষিণ কাল সে প্রকার দ্রুত বাড়ে নাই। গণিতের সূক্ষ্ম হিসাব হইতেই এই ব্যাপারটি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই ইহার সত্যতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইতেছে, এখন যেমন সাতাশ দিনে এক চান্দ্রমাস পূর্ণ হয়, তখন নিশ্চয়ই অধিক দিনে মাস শেষ হইত। হয় ত চান্দ্রমাসে দিবারাত্রির সংখ্যা এক সময়ে উনত্রিশও ছিল।

আমরা অনুমান করিয়া যে উনত্রিশ দিনে মাস শেষ হইবার কথা বলিলাম, গণিতজ্ঞ পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া অতি প্রাচীন যুগের এক সময়ে ঠিক ২৯ দিনেই এক চান্দ্রমাস অর্থাৎ একবার চন্দ্রের পূর্ণ প্রদক্ষিণ শেষ হইতে দেখিয়াছেন; ইঁহারা আরো দেখিয়াছেন চান্দ্রমাসে দিবারাত্রির সংখ্যা কখনই উক্ত ২৯ দিনের অধিক হয় নাই। ইহারও পূর্ব্বেকার যুগে চন্দ্র ও পৃথিবীর অবস্থা লইয়া হিসাব করিতে গিয়া তাঁহারা দেখিতেছেন, সে-সময়ে পৃথিবীর আবর্ত্তন-বেগ এত দ্রুত কমে নাই। কাজেই স্বীকার করিতে হইতেছে, যে-সময়ে এক চান্দ্রমাস ২৯ দিনে শেষ হইত তাহার পূর্ব্বযুগে চান্দ্রমাসে দিনের সংখ্যা অল্প ছিল। কি প্রকার গণনায় পণ্ডিতেরা ২৯কে চান্দ্রমাসের দিন-সংখ্যার চরম বৃদ্ধি বলিয়া স্থির করিলেন এবং কি প্রকার হিসাবেই বা তাহার পূর্ব্ব-যুগে চন্দ্রের প্রদক্ষিণ-কালের তুলনায় পৃথিবীর আবর্ত্তন-কালকে ধীরে ধীরে কমিতে দেখিলেন, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা কঠিন। পণ্ডিতেরা জটিল গাণিতিক হিসাবে যে ফল পাইয়াছেন, সেই ফলশ্রুতিতেই সন্তুষ্ট থাকা ব্যতীত আমাদের আর উপায় নাই।

যাহা হউক, যে-সময়ে উনত্রিশ দিবারাত্রিতে এক চান্দ্রমাস শেষ হইত, তাহার অতি পূর্ব্বে পৃথিবী ও চন্দ্রের অবস্থা কি প্রকার ছিল আলোচনা করিতে গিয়া জ্যোতিষীরা মাস এবং দিন উভয়কেই কমিতে দেখিতে পাইয়াছেন, কিন্তু এই কমা ঠিক্ তালে তালে না

হওয়াতে তাঁহারা মাস ও দিনের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমাসের দিনের সংখ্যাকেও কমিতে দেখিতে পাইয়াছেন। সুতরাং সুদূর অতীত যুগের এক সময়ে চাঁদ যখন একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিত, তখন আমাদের পৃথিবীও একবার মাত্র পূর্ণাবর্ত্তন দিত, এ প্রকার একটা সময়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা কঠিন হয় না। জ্যোতিষিগণ মানসচক্ষে অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সত্যই চাঁদ ও পৃথিবীর এই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাইয়াছেন। উভয় জ্যোতিষ্কের আবর্ত্তন ও প্রদক্ষিণ-কালের এই অপূর্ব্ব ঐক্য থাকাতে তখন চাঁদের একটা নির্দ্দিষ্ট দিকই পৃথিবীর দিকে উন্মুক্ত থাকিত এবং পৃথিবীর একটা নির্দ্দিষ্ট দিক চাঁদের প্রতি চাহিয়া থাকিত, অর্থাৎ পৃথিবীতে চাঁদের উদয়াস্ত ছিল না, এবং পৃথিবীর একার্দ্ধ চাঁদকে মোটেই দেখিতে পাইত না এবং চাঁদেরও পিছনের অর্দ্ধেকটা পৃথিবীকে দেখিতে পাইত না। চাঁদ ও পৃথিবীর এই সম্বন্ধটাকে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে; পৃথিবীর উপরিস্থ একটি শিলা-খণ্ডকে হাতে করিয়া শূন্যে ধরিয়া রাখিলে যেমন তাহার একটা দিকই ভূতলের এক নির্দ্দিষ্ট স্থানের দিকে উন্মুক্ত থাকে, পূর্ব্বোক্ত কালে চাঁদের অবস্থাটাও অবিকল তাহাই ছিল, পৃথিবীরই অঙ্গীভূত চাঁদকে কে যেন জোর করিয়া ভূতল হইতে উঠাইয়া আকাশে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল, তাই উদাহৃত শিলাখণ্ডের মত উহার একটা দিক্ই ভূ-পৃষ্ঠের এক নির্দ্দিষ্ট অংশের উপরে উন্মুক্ত থাকিত। জ্যোতিষীরা চাঁদ ও পৃথিবীর এই অঙ্গাঙ্গী-ভাবটাকে স্বীকার করিয়াছেন, এবং পৃথিবী হইতে সদ্য সদ্য বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরই উভয়ের এই অবস্থা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করিতেছেন। এই সময়ে পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে কত ব্যবধান ছিল হিসাব করা কঠিন; তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, সেই অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর আবর্ত্তন-কাল চারি পাঁচ ঘণ্টার অধিক ছিল না এবং চাঁদও পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসিতে ঐ সময়ের একটুও অধিক ক্ষেপণ করিত না।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হিসাব করিতে করিতে বর্ত্তমান হইতে দূর অতীতের দিকে ছুটিয়া জ্যোতিষীরা পৃথিবীর ক্রোড়ে চন্দ্রের যে অবস্থা দেখিতেছেন, তাহা হইতেই তাঁহারা বলিতেছেন, আমাদের পৃথিবী যখন বাষ্পাকারে ছিল তখন চন্দ্রের জন্ম হয় নাই। যখন সদ্য জমাট বাঁধিয়া পৃথিবী কোমল অবস্থায় ছিল, তখনই একদিন পৃথিবীর দেহ খণ্ডিত হইয়া চন্দ্রের জন্ম দিয়াছিল। ভূ-পৃষ্ঠ হইতে শিলাখণ্ড তুলিয়া নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন পৃথিবী ছাড়িয়া ক্ষণিক শূন্যে অবস্থান করে, সৌর-আকর্ষণের জোয়ার-ভাটার টানে পৃথিবীর কিয়দংশ ছিন্ন হইয়া চন্দ্রের মূর্ত্তিতে ঠিক্ সেই প্রকারেই শূন্যে উঠিয়াছিল এবং শিলা-খণ্ডের একটা দিক্ যেমন ভূ-পৃষ্ঠের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশের দিকে মুখ করিয়া থাকে, শিশু চন্দ্রেরও একটা দিক্ ঠিক সেই প্রকারেই পৃথিবীর এক নির্দ্দিষ্ট অংশের উপরে তাকাইয়া থাকিত।

এই ত গেল চন্দ্রের অতীত জীবনের কাহিনী, ইহার ভবিষ্য-জীবন-সম্বন্ধে জ্যোতিষীরা কি বলেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি চান্দ্রমাসের দৈর্ঘ্য এবং

আমাদের দিবারাত্রির দৈর্ঘ্য এখনও জোয়ার-ভাটার ফলে বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু আমাদের দিনের পরিবর্ত্তনটা চান্দ্রমাসের তুলনায় দ্রুততর হইতেছে। কাজেই বলিতে হয়, সেই অতি প্রাচীন যুগের মত বর্ত্তমান যুগেও চন্দ্রের প্রদক্ষিণকাল এবং পৃথিবীর আবর্ত্তন-কাল একই হইবার দিকে চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টায় বাধা দিবার কিছুই নাই, সুতরাং দূর ভবিষ্যতের এক সময়ে আমাদের চান্দ্রমাস ও দিনরাত্রির পরিমাণ যে একই হইয়া দাঁড়াইবে তাহা সুনিশ্চিত। কত কাল পরে পৃথিবী এবং চন্দ্র এই অবস্থায় উপনীত হইবে বলা কঠিন, তবে জ্যোতিষীরা হিসাব করিয়া সুস্পষ্ট দেখিয়াছেন, সেই সময়কার দিনগুলা আমাদের এখনকার ৫৫ দিনের সমান হইবে এবং এই ৫৫ দিনেই চন্দ্র একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া এক একটি চান্দ্র-মাসের উৎপত্তি করিতে থাকিবে। তখন চন্দ্রের উদয়াস্ত আর পৃথিবী হইতে দেখা যাইবে না, এবং পৃথিবীর একার্দ্ধ চন্দ্র দর্শনে চিরবঞ্চিত হইবে। মাস ও দিনের এই একতা কোন কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না।

চন্দ্র-লোকে জল নাই এবং তাহার আকাশে বায়ুরও অস্তিত্ব নাই; শিলামৃত্তিকা অবশ্যই আছে, কিন্তু জল-বায়ুর অভাবে তাহাতে আমাদের পরিচিত উদ্ভিদ্‌গণ জন্মে না। কাজেই চন্দ্রে আমাদের পরিচিত কোন প্রাণীই নাই। জ্যোতিষিগণ বলেন, জীবহীন চন্দ্র তাহার শুষ্ক দেহ পৃথিবীর দিকে বিস্তৃত রাখিয়া যে বিভীষিকা দেখাইতেছে, আমাদের পৃথিবীও কিছুকাল পরে ঐ প্রকারে মৃত হইয়া অপর গ্রহবাসীদের মনে বিভীষিকা উৎপাদন করিবে। সাধারণ উপগ্রহদের তুলনায় চন্দ্র আকারে বড় হইলেও পৃথিবীর তুলনায় ইহা অনেক ছোট, কাজেই ভূ-পৃষ্ঠের তরল পদার্থে চন্দ্রের আকর্ষণে যে জোয়ার-ভাটা চলিত, পৃথিবীর আকর্ষণে চন্দ্রে তাহা অত্যন্ত প্রবলভাবেই চলিত। এই জোয়ার-ভাটার প্রভাবই চন্দ্রের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ। চন্দ্রের আকর্ষণ অল্প হইলেও ইহা বহুদিন হইতে পৃথিবীর উপরে জোয়ার-ভাটা উৎপন্ন করিয়া আসিতেছে, সুতরাং ইহার যে অপকারিতা তাহা ধীরে ধীরে পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এমন এক সময় আসিবেই যখন এই ক্রমবর্দ্ধমান অপকারিতায় আমাদের ধনপূর্ণ বসুন্ধরা চন্দ্রের ন্যায়ই এক মহামরুতে পরিণত হইবে। কিন্তু ইহার জন্য আমাদিগের চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই, চন্দ্রের আকর্ষণজাত জোয়ার-ভাটার ফলে মৃত হইবার পূর্ব্বে অপর সহস্র সহস্র কারণে পৃথিবীর মৃত্যু ঘটিবে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

উৎপলা

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সদ্য পুরস্কার ও প্রতিশ্রুত পুরস্কার

বর্ষাপগমেই বিপুল মগধবাহিনী সীমান্তপ্রদেশে প্রেরিত হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে; তাহার পর রাজাধিরাজ স্বয়ং অবশিষ্ট সৈন্য-সামন্ত লইয়া কলিঙ্গ-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। গঙ্গাসাগর-সঙ্গম হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত কলিঙ্গ-দেশ তৎকালে শৌর্য্যবীর্য্যপ্রতাপে ভারতবর্ষ মধ্যে এক অতি দুর্দ্ধর্ষ মহারাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। রাজাধিরাজও এই শক্তি-শালী রাজ্যবিজয়ের বিপুল আয়োজন করিয়া-ছিলেন। নিজের অনুপস্থিতিতে বিশাল পৈত্রিক সাম্রাজ্য সুরক্ষণ ও রাজকার্য্য-পরিচালন জন্য অশোকদেব প্রতি বিভাগে উপযুক্ত কর্ম্মঠ বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত করিয়া-ছেন। কিন্তু এ আখ্যায়িকায় তৎসমস্ত বর্ণনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। শুধু একটী বিষয়ের উল্লেখ এখানে করিব। বহু রাজ্ঞী, ভোগিনী, আত্মীয়-কুটুম্ব, দাসদাসী, পরিজন পরিপূর্ণ বিশাল রাজান্তঃপুরে শান্তিরক্ষা অতি কঠিন ব্যাপার। শুধু মনস্বী মন্ত্রী অথবা শতসমরবিজয়ী সেনানী দ্বারা এ কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। মহারাজ্ঞী দেবী কারুবকীর প্রতি রাজাধিরাজ এই সুকঠিন কার্য্যের ভার দিয়াছেন। পরামর্শ জন্য ধীর প্রবীণ ধর্ম্মপাল অর্জ্জুনদেব এবং তাঁহার সহকারিত্বে সচিবপুত্র প্রমীতসেন নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিঙ্গযাত্রার পূর্ব্বে রাজাধিরাজ ও রাজ্ঞীর মধ্যে অনেক কথা হইয়াছে। রাজধানী এবং রাজাধিকৃত বিভিন্নদেশের কোথায় কোন্ বিষয়ে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, শত ষড়যন্ত্রময় সপত্নীসম্প্রদায় মধ্যে সর্ব্বদা সতর্ক সমদৃষ্টি রাখিয়া কেমন করিয়া চলিতে হইবে ইত্যাদি অনেক গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। দূরদেশে যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে এই রাজদম্পতির মধ্যে কৌতুক-পরিহাসেরও ক্রটী হয় নাই।

রাজাধিরাজ বলিয়াছিলেন—

"আট দশ দিনের জন্য মৃগয়ায় গিয়াছিলাম, তখন বিনা অনুমতিতে রাজকার্য্যের ভার তুমি লইয়াছিলে, এখন ত সমস্ত ভার তোমাকেই দিয়া যাইতেছি।"

"এবার রাজকারাগারে আর কেহ বন্দী থাকিবে না!"

"ধর্ম্মপাল এবার যাহার তাহার কথায় বন্দী মুক্ত করিবেন না, মঞ্জুলাও আর তোমাকে ধরিতে আসিবে না!"

"মঞ্জুলা!—মঞ্জুলার কি করিব?"

"ফিরিয়া আসিয়া তাহার বিবাহ দিব।"

"কোথায়? কাহার সঙ্গে?"

"তুমি একটী ভাল পাত্রের অনুসন্ধান করিও। আর, প্রমীতসেনকেই যদি তুমি উপযুক্ত মনে করিয়া থাক এবং মঞ্জুলা যদি প্রকৃতই তাহার অনুরক্তা হইয়া থাকে, তবে আর পাত্র খুঁজিবার কি প্রয়োজন? মঞ্জুলার মনের ভাব লীলা বুঝিতে পারিবে, আর, অন্তঃপুরের বিধি ব্যবস্থা প্রয়োজনে সৌবিদের সঙ্গে সর্ব্বদাই প্রমীতের দেখা শুনা হইবে।"

ইহার পর এক মাস গত হইয়াছে।

মঞ্জুলার দাসী চঞ্চলা কুমুদনিবাসে আসিয়াছে। উৎপলা মাধবীকে পাঠাইয়া মধ্যে মধ্যে মঞ্জুলার সংবাদ লইতেন। মঞ্জুলাও সেইরূপ চঞ্চলাকে পাঠাইয়া উৎপলা এবং প্রমীতসেনকে প্রণাম জানাইত।

উৎপলা এবং চঞ্চলায় অনেক কথা হইয়াছে। মঞ্জুলার ঘরসংসারের কথা, তাহার নিত্যকার্য্যের কথা, অভিভাবিকা মহারাজ্ঞী, মাতা অলোকা ঠাকুরাণীর কথা, অনেক কথা চঞ্চলা উৎপলাকে বলিয়াছে। শেষে উৎপলা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মঞ্জুলার বিবাহে এত বিলম্ব কেন?"

"সে অনেক কথা, আপনি হয় ত কিছু কিছু শুনিয়াছেন। তাঁহার বিবাহের জন্য মাতা অনেক দিন হইতে ব্যস্ত, কিন্তু তিনি নিজে এতদিন সে কথায় কান দেন নাই।"

"এই যে শুনিতেছি, সোমদত্ত মহাশয় না কি মঞ্জুলার বিবাহার্থী হইয়াছেন, অলোকা ঠাকুরাণীর নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন?"

"সোমদত্ত মহাশয় ত অনেক দিন হইতেই চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে মঞ্জুলা ঠাকুরাণীর কোন আগ্রহ বা সম্মতি থাকা কোন দিন বুঝিতে পারি নাই।"

"অমন রূপবতীর বিবাহে এত বিলম্ব! রাজ্ঞী কারুবকীর অভিপ্রায় কি কিছু বুঝিতে পার?"

"ভাল পাত্র জুটিলেই ঠাকুরাণীর বিবাহ দিবেন।"

"সোমদত্ত মহাশয়ের সঙ্গে হইবে না?"

"সম্ভাবনা কম। কাল রাজ্ঞীর পরিচারিকা লীলা আসিয়াছিল। তিনি যেন কেমন করিয়া সোমদত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবের কথা জানিতে পারিয়াছেন। লীলার আলাপে বুঝা গেল, এ প্রস্তাবে রাজ্ঞীর মত নাই।"

সুহৃৎ-বৎসলা উৎপলার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু চাঁদের কিরণ যে কুমুদনিবাসও প্রতপ্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, চঞ্চলা তাহার কোন ইঙ্গিত দিল না। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অত বড় কথার প্রসঙ্গ করিতে দাসী সে, সাহস পাইল না। কিন্তু চঞ্চলা বিস্মিত হইল, উৎপলা কি অন্ধ?

উৎপলা বলিলেন—

"লোকে সোমদত্ত মহাশয়ের তত প্রশংসা করে না, এ বিবাহ না হইলেই ভাল।"

বিষবৃক্ষের বীজ বায়ুবেগে দূরে বিক্ষিপ্ত হইতে দেখিলে বুদ্ধিমান হৃষ্ট হয়, কিন্তু অদূরদর্শী সে বীজ কুড়াইয়া আনিয়া আপনার উদ্যান-প্রান্তে উপ্ত করে।

উৎপলা সেদিন সেই সংবাদের জন্য এক ছড়া হার দিয়া চঞ্চলাকে পুরস্কৃত করিলেন।

চঞ্চলা চলিয়া গেলে উৎপলা উৎফুল্লচিত্তে স্বামীকে বলিলেন—

"রক্ষা পাওয়া গেল! মঞ্জুলার সঙ্গে সোমদত্তের বিবাহ-প্রস্তাবে রাজ্ঞী কারুবকী অমত প্রকাশ করিয়াছেন!"

"কেমন করিয়া জানিলে?"

"মঞ্জুলার দাসী চঞ্চলার নিকট শুনিলাম।"

প্রমীতসেনের মুখেও হাসি দেখা দিল। উপস্থিত আশঙ্কার হেতু দূর হইলে মানুষ সুখী হইয়া থাকে, কিন্তু সেই দূরীভূত হেতুই যদি গুরুতর অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত করে, সুখের সংসারে অনৈক্য, অকল্যাণের সম্ভাবনা আনয়ন করে তবে সে সুখে মানুষ উৎফুল্ল হয় না। প্রমীতসেন চিত্ত বশ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

প্রমীত হাসিলেন, কিন্তু উৎপলার উৎফুল্ল সরল মুখ দেখিয়া তাঁহার আত্মদ্রোহী চিত্ত সন্তপ্ত হইল। মনে মনে দেবতার আশীর্ব্বিধান প্রার্থনা করিয়া প্রমীতসেন উৎপলার ললাটদেশ পরিচুম্বিত করিলেন।

এদিকে চঞ্চলা ভাবিতে ভাবিতে কমলপুরের পথে চলিল। ব্যাপার মন্দ নহে '—সোমদত্ত মঞ্জুলার জন্য পাগল, মঞ্জুলা প্রমীতসেনের জন্য পাগল। আর যে প্রমীতসেন উৎপলার কথায় উঠিত, উৎপলার কথায় বসিত, যে প্রমীতসেন উৎপলার মুষ্টিগত ছিল, সেই প্রমীতসেন এখন মঞ্জুলার জন্য উন্মত্ত! আর, উৎপলা চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কিছুই সন্দেহ করে না! ভাল, ইহার মতিগতি ত বুঝিলাম, এখন আমার বাসনা কোন্ দিকে? আমার বাসনা!—আমি কে? আমার কি কোন স্বার্থ আছে? আছে বৈ কি। মঞ্জুলা সোমদত্তের গৃহিণী হইলেই আমার সুবিধা? না—প্রমীতসেন যদি মঞ্জুলাকে বিবাহ করে, তবেই আমার লাভ? মঞ্জুলার অতুল ঐশ্বর্য্য। রূপে গুণে না হউক—রূপগুণের মর্য্যাদা সোমদত্ত কি বুঝিবে?—ধন-সম্পত্তিতে সোমদত্ত মঞ্জুলার অনুগত হইবে। সোমদত্তকে হাতে রাখা সহজ হইবে। আর যদি মঞ্জুলা প্রমীতসেনের গৃহে যায়, তবে সে গৃহে কি আমি কোন পদ পাইব? অবোধ মঞ্জুলা কি প্রমীতসেনকে আঁক্ড়িয়া রাখিতে পারিবে? উৎপলা পরাজয় স্বীকার করিবে? রাজ্য-পাট ছাড়িয়া দিবে? শুধু রূপে ভুলিয়া, (মঞ্জুলাই কি অধিক রূপসী?) কণ্ঠস্বরে পাগল হইয়া প্রমীতসেন উৎপলাকে বিসর্জ্জন দিবে? তখন আমার দশা কি হইবে? মাধবীর মন যোগাইয়া চলিব?—উৎপলা ত আমার কোন ক্ষতি করে নাই, তবে তার বিরুদ্ধে যাইব কেন? কেন তাহার একাধিপত্য সংসারে অংশী প্রবেশের সাহায্য করিব?—ভাবিবার বিষয় বটে! এদিকে লীলা যেরূপ আলাপ করিয়া গিয়াছে, তাহাতে সোমদত্তের প্রস্তাবে রাজ্ঞী যে সম্মত হইবেন, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? —দেখা যাক্, কি হয়!

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পথের পার্শ্বেই প্রশস্ত পুষ্পোদ্যান, পুষ্পোদ্যানের মধ্যেই সুরম্য তারা-মন্দির। দেবীর সন্ধ্যারতি দেখিবার জন্য সেখানে শত নরনারীর সমাগম হইয়াছে। চঞ্চলা উদ্যানে প্রবেশ করিল না; সন্ধ্যা হইয়াছে শীঘ্রই গৃহে ফিরিতে হইবে। সে পথিপার্শ্বেই নতজানু হইয়া শ্রীমূর্ত্তির উদ্দেশে প্রণাম করিয়া পুনরায় চলিবে এমন সময় সোমদত্ত সেখানে উপস্থিত হইলেন। চঞ্চলা তাঁহাকেও নমস্কার অভিবাদন করিল। সোমদত্ত বলিলেন;—

"কোথায় গিয়াছিলে, চঞ্চল ?"

যে দুর্ব্বার কামনা নিরন্তর সোমদত্তের চিত্তে জাগরিত ছিল, চঞ্চলা তাহা জানিত। সে লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না; সোম দত্তের দিকে চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া একটী ক্ষুদ্র শাণিত শর নিক্ষেপ করিল, বলিল ;—

"কুমুদনিবাসে গিয়াছিলাম।"

শরাভিহত সোমদত্ত অতি নিকটে আসিয়া বলিলেন ;—

"কুমুদনিবাসে যে আজকাল তোমাদের অতি ঘন ঘন যাতায়াত !"

"দাসী মানুষে তাহার হেতু কি করিয়া জানিবে ?"

"চঞ্চলা, একটুকু ভিতরে যাইবে ?—বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

"গৃহে মঞ্জুলা ঠাকুরাণী আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, অধিক বিলম্ব করিতে পারিব না।"

অনুচর বাহুককে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া চঞ্চলা সোমদত্তের সঙ্গে উদ্যান-মধ্যস্থ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিল।

আরতি আরম্ভ হইয়াছে। ঘৃতপুষ্ট সারি সারি দীপালোকে গৃহ আলোকিত, ষোড়শাঙ্গ গন্ধ-ধূপে সুরভিত, শঙ্খ-ঘণ্টা-রবে মুরজ-মৃদঙ্গ সহযোগে গীত-স্তুতি-সঙ্গীতধ্বনিতে মন্দির উদ্যানভূমি সমস্ত মুখরিত হইতেছিল।

কিন্তু তখন দেবী দর্শন-বাসনা অথবা দেবীর আশীর্ব্বাদ-কামনা সোমদত্তের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। এক কোণে দাঁড়াইয়া সোমদত্ত বলিলেন ;—

"অনেক দিন হইতে আমি হৃদয়ে যে বাসনা পুষিয়া আসিতেছি, তুমি তাহা জান; তাহা সফল হইবে কি ?"

"দেবতা জানেন! সামান্য দাসী আমি, আমি কেমন করিয়া জানিব ?"

"দেখ, তুমি অন্তরঙ্গ সখী; তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই। প্রমীতসেন কি কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন ?"

"না; অন্ততঃ আমি ত অমন কোন কথা শুনি নাই !"

প্রমীতসেন যে চাঁদের কিরণে দগ্ধ হইতে-ছেন, সে ত চঞ্চলারই কল্পনা। সেই কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া কি কাহাকেও বলা যায়—প্রমীতসেন মঞ্জুলার জন্য উন্মত্ত হইয়াছেন ?

"প্রমীতসেন ত অনেকবার কমলপুরে তোমাদের গৃহে গিয়াছেন ?"

"তা ঠিক।"

"মঞ্জুলাও কুমুদনিবাসে গিয়াছে ?"

"অনেক বার।"

"কেন ?"

"দেখা-সাক্ষাৎ। প্রমীতসেন মহাশয়ের স্ত্রী উৎপলা দেবী যে ঠাকুরাণীর পরম সুহৃৎ।"

"শুধু কি তাই ?"

"আর কি হইতে পারে ?"

সোমদত্ত ইতস্তত করিলেন, শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"প্রমীতসেন কি কেহ নহেন ? মঞ্জুলা—মঞ্জুলার মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারিয়াছ ?"

"পুরুষে যাহা বুঝিতে পারে না, স্ত্রীলোকে কি তাহা বুঝিবে ?"

"দেখ, তোমাকে বলিয়াছি—সহস্র মুদ্রা তোমার পুরস্কার !"

"তাহাতে কত দিন চলিবে ?"

"আর চিরকাল সংসারে কর্ত্তৃত্ব।"

"তুচ্ছ করিবার বিষয় নয়। কিন্তু—"

"কি ?"

"রাজ্ঞী যে ঠাকুরাণীর অভিভাবিকা! তাঁহার এবং রাজাধিরাজের অভিপ্রায় ভিন্ন কি ঠাকুরাণীর বিবাহ হইতে পারে ?"

"তুমি সহায় থাকিলে হইতে পারিবে।"

"আমার যে এত ক্ষমতা আছে, তাহা ত আমি জানি না। তবে আমার দ্বারা যদি কোন সাহায্যের সম্ভাবনা থাকে—"

"আছে।"

"দাসী বলিয়া পায়ে রাখিবেন।"

"পরম সুহৃদ বলিয়া চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিব।"

চঞ্চলা দুই হাত যোড় করিয়া বিনীত নমস্কার জানাইল। তখন উভয়ে বাহিরে যে যাহার গন্তব্য পথে চলিল।

পথে বাহুক চঞ্চলাকে জিজ্ঞাসা করিল;—

"সোমদত্ত মহাশয়ের সঙ্গে কি ঠাকুরাণীর বিবাহ হইবে ?"

চঞ্চলা বিরক্ত হইল। এই অতি গুরুতর বৃহৎ ব্যাপারের কথা লইয়া অবোধ মহামূর্খ বাহুকের সঙ্গে আলাপ! চঞ্চলা বলিল;—

"কেমন করিয়া বলিব ? তোর মনে কি হয় ?"

"কেন, সোমদত্ত মহাশয় ত বেশ লোক।"

চঞ্চলা বুঝিতে পারিল, সোমদত্ত বাহুককেও বাধ্য করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দৈবজ্ঞের গণনা

পৌষমাস, পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা। পাটলীগ্রামে গঙ্গা ও হিরণ্যবতীর সঙ্গম-স্থলে আজ মহাঘটা। সনাতন-ধর্ম্মনিষ্ঠ নরনারী আজ পুণ্যতিথিতে সেই পবিত্র স্রোতে স্নান করিয়া যাগ-যজ্ঞ-তর্পণ-দান-ধ্যানে দিন অতিবাহিত করিতেছেন। দিনান্তে চন্দ্রোদয়ে পুরশ্চরণ শেষ করিয়া অনেকে সেই প্রসন্ন সলিলে পুনরবগাহন করিয়া রাত্রিতে গৃহে ফিরিবেন। শিশিরভীত বালক-বালিকারা স্রোতোজল স্পর্শ করিয়া পরস্পরের অঙ্গে প্রক্ষিপ্ত করিয়া কেহ কেহ বা সেই কলনাদী স্রোত দূর হইতে দর্শনমাত্র করিয়াই উল্লসিত হইতেছে।

কৃষক-কৃষকপত্নী—গৃহস্থ মাত্রেরই আজ অতি আনন্দের দিন। শতবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া হৈমন্তিক স্বর্ণ-শস্য গৃহে আগত হইয়াছে। গৃহিণীর মুখশ্রী আজ উৎফুল্ল; স্নাতদেহা প্রফুল্লচিত্তে গৃহে ফিরিতেছেন, স্বামী পুত্র কন্যা আত্মীয় পরিজন সকলকে আজ নবান্ন-পিষ্টকে আপ্যায়িত করিবেন। কাহারও কক্ষে পূর্ণকুম্ভ, উন্নদ্ধ কবরীতে ফুলের মালা—বিকশিত কোমলাঙ্গের কি বঙ্কিম ভঙ্গি! কাহারও অবেণীবদ্ধ বিপুল কুন্তলরাশির অগ্রভাগ শিথিল বন্ধনে সংযত, মস্তকে পূর্ণকুম্ভ, বক্ষে বা কক্ষে সুকুমার শিশুপুত্র—মাতৃদেবীর কি সৌম্য মোহিনীমূর্ত্তি। কেহ দ্রুতপদে, কেহ বা মন্থর গমনে; কোথায়ও বালিকা যুবতী প্রৌঢ়া দলবদ্ধ হইয়া মধুর কণ্ঠে একতালে সুরতরঙ্গিণীর বন্দনাগীতি গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইতেছেন।

স্থানে স্থানে নানা প্রকার আমোদপ্রমোদ-নাট্যরঙ্গের ঘটা। যুবকগণের ব্যায়াম-কৌশল, মল্লযুদ্ধ দেখিবার জন্য বহুলোকের জনতা হইয়াছে। মুখোস পরিয়া ভূত প্রেত

রাক্ষস অথবা বানর ভল্লুক ইত্যাদি পশুর অভিনয় করিয়া অনেকে যুবক-যুবতীগণের আনন্দ এবং বালক-বালিকাগণের ভীতি উৎপাদন করিতেছে। নিকটেই অনতিবৃহৎ মেলা বসিয়াছে। সেখানে ক্ষুদ্র চালা, চাঁদোয়া এবং পট্টাবাসের নীচে নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে। কাঠের পুতুল, মাটির পুতুল, নানা প্রকার খেলানা, বাঁশী, শিঙ্গা বালক-বালিকাদের চিত্ত প্রলুব্ধ করিতেছে; আর তাহাদের দুর্ব্বার আকর্ষণে মাতৃমণ্ডলীর বেশভূষা পরিধেয় বিশৃঙ্খল হইতেছে। গৃহিণীরা মাটীর ভাঁড়, হাঁড়ি, কলসী ইত্যাদি সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং যুবতীরা আলতা, সিন্দুর, মুকুর, কঙ্কতি, দন্তমঞ্জন, কষায়বর্ণ প্রভৃতি অঙ্গপ্রসাধন সামগ্রী নিজেরা দেখিয়া শুনিয়া নির্ব্বাচিত করিতেছেন। এ সুযোগ তাঁহাদের অদৃষ্টে সকল সময় সঙ্ঘটিত হয় না। কিন্তু তীর্থস্থানে আর্য্যরমণী এ স্বাধীনতাটুকু চিরদিন ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

নিকটেই নদীতীরে অনতিবৃহৎ এক আম্র-কানন মধ্যে আর এক ব্যাপার। সেখানে মুণ্ডিতমস্তক পীতবাস-পরিহিত পরিব্রাজক, শ্রমণ, ভিক্ষু, ভিক্ষুণী এবং উপাসক-উপাসিকা আবাল বৃদ্ধ বালক বালিকা অনেকে উপস্থিত। এই পুণ্যতিথিতে পুণ্যতোয়ায় স্নানান্তে বৃক্ষ-চ্ছায়ায় সমাগত অনেকে উপাসনা, ধ্যান-ধারণা, শ্লোকপাঠ, আবৃত্তিতে দিন অতিবাহিত করিতেছেন। অনেকে জ্যোৎস্নাময়ী রজনী এই ভাবেই যাপন করিবেন। অনেকে উপোষিত রহিয়াছেন, অনেকে ভিক্ষু, উপাসক, উপাসিকা এবং দীন-দরিদ্রগণকে ভোজন করাইতেছেন। ভগবান তথাগতের নবধর্ম্মমতাবলম্বিগণের নিকটও এই পৌষী পূর্ণিমা অতি পবিত্র এবং পুণ্যার্জ্জনের উপযুক্ত বিশুদ্ধ কাল বলিয়া পরিগণিত ছিল।

মেলার অপর পার্শ্বে তিন চারিখানি পট্টাবাস। তাহার প্রত্যেকখানিতে এক একজন দৈবজ্ঞ ঠাকুর যৎসামান্য মুদ্রা অথবা ফলমূলতণ্ডুল পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া সমাগত জিজ্ঞাসু নরনারীর অদৃষ্ট-গণনায় নিযুক্ত ছিলেন। অনেক স্ত্রীপুরুষ নিজের ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য ইহাদের অন্যতরের নিকট যাইতেছিলেন। রমণীরা যখন অদৃষ্ট গণনা করাইতেছেন, তখন পুরুষেরা সেখানে প্রবেশ করিতেছেন না। এক দল রমণীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে একদল পুরুষ, এই পর্য্যায়ক্রমে দৈবজ্ঞগণ লোকের ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতেছেন।

এই পুণ্যদিনে নগরের অনেক সম্ভ্রান্ত স্ত্রীপুরুষ গঙ্গার পবিত্রস্রোতে স্নানার্থী। অনেকে স্নানান্তে নগরে ফিরিতেছেন, অনেকে নগর হইতে আগমন করিতেছেন। কেহ কেহ বা কৌতূহলপরবশ হইয়া স্নানান্তে দৈবজ্ঞ ঠাকুরদিগের নিকট যাইতেছেন।

উৎপলাও স্নানে আসিয়াছিলেন। অনেকের মুখে এই দৈবজ্ঞ ঠাকুরের কথা শুনিয়া তাঁহারও কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল; স্নানান্তে তিনিও সেই দিকে গেলেন। ভৃত্য দারুক এবং বাদলকে বাহিরে রাখিয়া মাধবীকে সঙ্গে লইয়া উৎপলা পট্টাবাসের এক খানিতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে স্থিরগম্ভীর মূর্ত্তি, শিখা এবং ত্রিপুণ্ড্রকধারী এক জন প্রাচীন দৈবজ্ঞ একে একে রমণীগণের অদৃষ্ট গণনা

করিতেছিলেন। গণনাফল শুনিয়া অনেকের মুখ প্রফুল্ল হইতেছিল, আবার কাহারও নয়নপ্রান্তে চিন্তাবিষাদের রেখা দেখা দিতেছিল। কোন কোন ভীরুহৃদয়া দৈবজ্ঞকে হাত না দেখাইয়াই তথা হইতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। বিধাতা মানুষের অদৃষ্টলিপি মানব-চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছেন, তাই মানুষের চিত্ত নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ। কিন্তু মানুষ চিরকালই নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে চায় এবং এই চেষ্টার ফলে চির জীবন উদ্বেগ, আশঙ্কা অথবা উৎকট আশংসাময় করিয়া ফেলে।

সাময়িক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া উৎপলা সেখানে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার চিত্ত ভীত হইল। দৈবজ্ঞ একটী রমণীর অদৃষ্ট গণনা শেষ করিয়া উৎপলার দিকে চাহিলেন, বলিলেন ;—

"মা, তুমি হাত দেখাইবে ?"

উৎপলাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া মাধবী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিল ;—

"হাঁ ; বিধাতা ইঁহার অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন, দেখুন।"

মাধবী উৎপলাকে ধরিয়া দৈবজ্ঞের সম্মুখে নিকটে আনিয়া বসাইল এবং তাঁহার বামহস্ত প্রসারণ করিয়া দৈবজ্ঞের সম্মুখে ধরিল।

দৈবজ্ঞ ঠাকুর বহুক্ষণ ধরিয়া সে হস্ত পরীক্ষা করিলেন। করতলস্থ বক্র, অবক্র, ঊর্দ্ধরেখা, ধন, আয়ু, প্রিয়সৌভাগ্য, সন্তানরেখা, যবচিহ্ন, মৎস্যপুচ্ছ, অঙ্গুলির মধ্য রেখা, অগ্রভাগস্থ আবর্ত্তচিহ্ন ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়া উৎপলার আশঙ্কা-লজ্জাবিজড়িত আরক্ত আয়ত নতচক্ষু, সুন্দর মুখ, সমোন্নত ললাট, উজ্জ্বল সিন্দূরবিন্দু-পরিশোভী সীমন্ত, আর তাঁহার নিবিড়কৃষ্ণ স্নিগ্ধ কুঞ্চিত কেশদাম অতি মনোযোগের সহিত দেখিয়া দৈবজ্ঞ ক্ষণকালের জন্য মুখ অবনত করিলেন। শেষে উৎপলার দিকে চাহিয়া বলিলেন ;—

"মা, আমি প্রাচীন হইয়াছি। একাল পর্য্যন্ত বহু রমণী—ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ কুলজাত শত শত রমণীর ভাগ্য আমি পরীক্ষা করিয়াছি ; কিন্তু, মা, তোমার মত শুভলক্ষণযুক্তা রমণী আমি আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।"

উৎপলার লজ্জাবিজড়িত মুখে বাক্য সরিল না। মাধবী জিজ্ঞাসা করিল ;—

"ঠাকুর কি দেখিলেন ?"

"ইনি চিরজীবী হইয়া পতিপুত্রধনধান্যে, গৃহসংসার-মানসম্পদে চিরসুখী হইবেন।"

মাধবী ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল ;—

"ইনি পুত্রবতী হইবেন ?"

"হাঁ।"

দৈবজ্ঞ ক্ষণকালের জন্য পুনরায় উৎপলার হাতের বিশেষ কোন কোন অংশ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন ;—

"হাঁ। অচিরেই অতি সুলক্ষণযুক্ত এক সুন্দর পুত্র লাভ করিবেন এবং সেই পুত্রের দ্বারা বৃদ্ধ বয়সে, আমরণকাল পর্য্যন্ত ইনি পরম সুখী হইবেন।"

মাধবীর চক্ষু হইতে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইল। উৎপলার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

গণনা এবং ফলশ্রুতি শেষ হইয়াছে। উৎপলা মস্তক নত করিয়া যুক্তকরে ঠাকুরকে নমস্কার অভিবাদন করিলেন। অঞ্চলপ্রান্ত-

বদ্ধ স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র মুদ্রা যাহা কিছু ছিল, সমস্ত দৈবজ্ঞের পাদমূলে রাখিয়া কম্পিত কলেবরে উৎপলা পট্টাবাস হইতে বহির্গত হইলেন।

বাহিরে আসিয়াই উৎপলা মাধবীকে বলিলেন;—

"আমার হাত দেখিয়া দৈবজ্ঞঠাকুর যাহা কিছু বলিলেন, তাহা তুই কাহাকেও বলিস না।"

মাধবীর জিহ্বা কণ্ডূয়ন তখনই আরম্ভ হইয়াছিল, এমন সুসংবাদ কাহাকেও দিবে না! সে বড়ই বিস্মিত হইল।

"কাহাকেও বলিব না?"

"না।"

বহুদিনের গূঢ়পুষ্ট ঐকান্তিক কামনা, যাগ-যজ্ঞ, দেবারাধনা—সিদ্ধ হইবে! উৎপলার মুখ হর্ষবিকশিত হইয়া উঠিল। সিদ্ধ হইবে কি?—যদি না হয়! উৎপলার চিত্ত ক্লিষ্ট, বেদনাময় হইয়া উঠিল। বিধাতার হাতে ভবিষ্যৎ। উৎপলা মুহূর্ত্তের মধ্যে অনেক ভাবিয়া দৈবজ্ঞের উক্তি প্রকাশ করিতে মাধবীকে নিষেধ করিলেন। আনন্দে উৎসাহে উৎফুল্ল মাধবীর মুখ ক্ষুণ্ণই হইল।

উৎপলা আর বিলম্ব করিলেন না। সেই স্থানেই শিবিকারোহণ করিয়া দাসদাসীসহ নগরে নিজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরেই মঞ্জুলা সেখানে উপস্থিত হইল। দৈবজ্ঞের খ্যাতি চারি দিকে প্রচার হইয়াছিল। মঞ্জুলার অদৃষ্টলিপি-উদ্ধার জন্য চঞ্চলাই অধিক ব্যস্ত। চঞ্চলা ঘরে নাই, মঞ্জুলাকে সেখানে লইয়া আসিয়াছে। মঞ্জুলাও নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিল না। যে দিন রাজ্ঞী কারুবকী তাহাকে সংসারী হইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে মঞ্জুলার মনে এক নূতন ভাব প্রবেশ করিয়াছে। সংসারী হইব?—বিবাহ! আজ মঞ্জুলা ভাবিল, অদৃষ্টে কি লেখা আছে একবার দেখি না কেন?—অদৃষ্ট-লিপি কি মানুষ ঠিক করিতে পারে?

দৈবজ্ঞ অনেকক্ষণ ভাবিয়া মঞ্জুলার হাত পরীক্ষা করিলেন, তাঁহার যেন তৃপ্তি হইল না। তিনি মঞ্জুলার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় তাহার হস্ত-পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন; শেষে বলিলেন;—

"কোন কোন মানুষের ভাগ্য সহজে নির্ণয় করা কঠিন। মা, হাত দেখিয়া তোমার ভবিষ্যৎ আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

মঞ্জুলা বলিল;—

"শুনিয়াছি, এ শাস্ত্রে আপনি মহাজ্ঞানী।"

"মানুষের জ্ঞান চিরকাল সীমাবিশিষ্ট।—মা, তুমি একবার দাঁড়াও ত।"

ভবিষ্যৎ গণনায় দৈবজ্ঞের কৃতিত্ব সম্বন্ধে মঞ্জুলার সন্দেহ উপস্থিত হইল; তখনি মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল। দৈবজ্ঞ একটুকু অগ্রসর হইয়া বসিলেন এবং মঞ্জুলার পদাঙ্গুলিদামের অবস্থান প্রণালী ও সমাবেশ, গুল্‌ফদেশ ও ভূমিতে তাহার পদবিন্যাসক্রম ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন;—

"মা, আমি দেখিতেছি, তোমার ভবিষ্য জীবন অতি পুণ্যময়; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, তোমার অদৃষ্টে গৃহসংসার নাই—অথবা আমার শাস্ত্র-শিক্ষাই অসম্পূর্ণ।"

বিস্মিত চঞ্চলা জিজ্ঞাসা করিল;—

"ঠাকুর ইঁহার পরমায়ু কত দিন ?"

"ইনি দীর্ঘায়ু হইবেন ; তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।"

মঞ্জুলার স্বভাবচঞ্চল চিত্ত স্থিরগম্ভীর হইল, তাহার চিরস্ফুরদুজ্জ্বল আয়ত চক্ষু কেমন যেন হীনাভ হইল। মঞ্জুলা দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে পুরস্কৃত করিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

সে রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিয়া মঞ্জুলা অনেকক্ষণ যেন কি ভাবিল, শেষে চঞ্চলাকে ডাকিয়া কাছে আনিয়া বলিল ;—

"চঞ্চলা, দৈবজ্ঞঠাকুর আমার ভবিষ্যৎ যাহা কিছু বলিয়াছেন, কাহাকেও তাহা জানাস্ না।"

"তুমি নিষেধ করিলে, জানাইব না।—কিন্তু কেন ?"

"আমার অদৃষ্টে যে ঘর সংসার নাই।"

চঞ্চলা হাসিল, বলিল ,—

"ঐ বৃদ্ধ ঠাকুরের কথায় তুমি বিশ্বাস কর ?—আর, তিনি নিজেই ত বলিয়াছেন, তাঁহার শাস্ত্রশিক্ষা অসম্পূর্ণ।—তুমি ইচ্ছা করিলে——"

"কি রে ?"

"তুমি ইচ্ছা করিলে কালই তোমার ঘর-গৃহস্থালী আরম্ভ হইতে পারে।"

"বটে ? কেমন করিয়া ?"

চঞ্চলা একটুকু ইতস্ততঃ করিল, শেষে বলিল,—"আজ কত দিন হইতে সোমদত্ত মহাশয় ত—"

মঞ্জুলা কথা বলিল না, মুখ ফিরাইয়া বাম হস্ত উঁচু করিয়া নিষেধ-সঙ্কেত করিল।

চঞ্চলা দেখিল, এ ঢিল লাগিল না ; তখন সাহস করিয়া পুনরায় বলিল ;—

"তোমার ইঙ্গিত পাইলে প্রণীতসেন মহাশয়- "

মঞ্জুলা তখন চঞ্চলার দিকে অতর্কিত-সতৃষ্ণ নয়ন ফিরাইয়া বলিল ;—

"তুই পাগল হইয়াছিস্ ?"

"আমি পাগল না—তুমি অন্ধ ?"

"অমন অসম্ভব কথা কেমন করিয়া তোর মনে উঠিল ?"

"অসম্ভব কথা ?—তুমি বলিয়াছ বটে, আমার পাষাণের শরীর ; কিন্তু মল্লিকা মালতী যে কেন অঙ্গ দগ্ধ করে—তুমি রাগ করিও না, আমি তোমার দাসী—কাহার অঙ্গ যে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা আমিও বুঝিতে পারিয়াছি।"

"তুই স্বপ্ন দেখিয়াছিস্ !"

"—আর চাঁদের কিরণ যে কুমুদনিবাসও উত্তপ্ত করিয়াছে, তাহাও আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

"দূর, অভাগী। সেখানে যে অমন স্নেহময়ী, অমন রূপবতী, প্রাণপ্রিয়া উৎপলা রহিয়াছেন, চাঁদের কিরণ ত সেখানে অমৃত বর্ষণ করে !"

"তবে আমিই অন্ধ।"

"তাহার কোন সন্দেহ নাই।—রাত্রি অনেক হইয়াছে, এখন শুইয়া থাক গিয়া।"

বুদ্ধিমতী চঞ্চলা দেখিল, এ ঢিল লাগিয়াছে, সে আর কথা বাড়াইল না ; সে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

রমণীহৃদয় যখন নবীন অনুরাগে পরিপূর্ণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তখন বিশ্বাসী অন্তরঙ্গের

নিকট গোপনে সে কথা মৃদু মৃদু প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু মুখ ফোটে না, কেননা সেই অননুভূতপূর্ব্ব নবীন ভাবের মোহকর প্রকৃতি বা স্বরূপ তখনও সে অভিব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না, অপর দিকে স্বাভাবিক লজ্জা, সঙ্কোচ এবং মৃদু ভীতি আসিয়া বারণ করে। মঞ্জুলার তাহাই হইল। মনের ভাব মঞ্জুলা মুখে প্রকাশ করিল না, কিন্তু চঞ্চলা যে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, তাহা বুঝিল। তখন শয্যায় পড়িয়া একাকিনী ভাবিতে লাগিল;—সত্য সত্যই কি তিনি—তাঁহার মন—?

—মনে করিতে মঞ্জুলার অনাবিল মানস-সরোবরে মনোমদ এক নবীন ভাবের মৃদুমন্দ তরঙ্গ উপস্থিত হইল।

কিন্তু যাহার অদৃষ্টে বিধাতা গৃহ-সংসার লেখেন নাই, তাহার আর সে কল্পনায় কি লাভ? (ক্রমশ)

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

সাগর-কথা

কোন বন্ধুজনের প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন "আমি যখন মায়ের ইচ্ছা পূরণের জন্য বাড়ী যাইবার পথে দামোদরে ঝাঁপ দিয়াছিলাম, তখন কি আর দামোদরের বন্যা-মুখে তাহার সেই খরস্রোতে ঝাঁপ দিতেছি ইহা স্মরণ ছিল? তখন সেই দামোদরের প্রবল প্রবাহকে মায়ের অশ্রুপ্রবাহ বলিয়া মনে হইয়াছিল, মাতৃপদ ধ্যান করিতে করিতে মাতৃদেবীর অশ্রুপ্রবাহে ঝাঁপ দিয়াছিলাম।"

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে রথযাত্রায় বাঙ্গালাদেশের নানা স্থানের সাত আটশত স্ত্রী-পুরুষযাত্রীপূর্ণ "স্যর জন লরেন্স" নামক একখানি ষ্টীমার পুরী যাইবার পথে বঙ্গোপ-সাগরে জলমগ্ন হয়। এই নিদারুণ দুর্ঘটনায় বঙ্গদেশের নানা স্থানে গৃহে গৃহে "হাহাকার" উঠিয়াছিল। সে মর্ম্মবেদনাদায়ক লোকক্ষয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে দারুণ মনস্তাপ ও তীব্র যাতনার সঞ্চার করিয়াছিল। সে সময় তাঁহাকে বালকের ন্যায় রোদন করিতে দেখিয়াছি। এই দুর্ঘটনার পর কয়েক-দিন তিনি অতিকষ্টে দিন যাপন করিয়াছিলেন। সে সময় যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, তাহারই সহিত ঐ শোকাবহ লোকক্ষয়ের আলোচনা ও সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেন। তাঁহার সে মর্ম্মভেদী আক্ষেপোক্তি পাষাণহৃদয়েও মর্ম্মবেদনার সঞ্চার করিত। ঐ সময় আমি একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাঁহাকে নিতান্ত বিষণ্ণ ও কাতর দেখিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, "আমার মনে বড় অশান্তি।" আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"সাত শত লোক এক দিনে একত্রে ডুবিয়া মরিল, বিধাতা কি এই সাত শত লোকের মৃত্যু একদিনে এক

সময়, এক রকমে ঘটিবে, স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন? এই বিধাতাকে তোমরা দয়াময় ঈশ্বর বলিয়া ডাক।" আমি ত অবাক। মুখে একটি কথাও সরিল না। কেবল কাতর দৃষ্টিতে তাঁহার অশ্রুপ্লাবিত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর উত্তেজিত স্বরে বলিলেন "ব'লো না, এমন ঈশ্বরকে দয়াময় ব'লো না। দয়াময় ঈশ্বর সাত শত লোককে একত্রে ডুবাইয়া কি অসীম দয়ার পরিচয় দিলেন? এই কি দয়া?" এই আক্ষেপোক্তিসহ বালকের ন্যায় রোদন দেখিয়া সত্যই সে দিন আমি নিতান্ত ব্যথিত, কাতর ও অবসন্ন বলিয়া অনুভব করিয়াছিলাম। আর আমার হৃদয়ে, ঈশ্বরের দয়ার উপর যে অকৃত্রিম বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল তাহাতে সন্দেহের ছায়াপাত হইতেছিল। হৃদয়ের তীব্র তাড়নায় ও তিরস্কারে আমি জীবনে এই একদিন মাত্র তাঁহার সম্মুখে তাঁহার কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলাম "আপনার কথায় মনে হইতেছে, ভগবান দয়াময় নন্, আর এই সাত শত লোকের এই বিষম পরিণামের মধ্যে তাঁহার দয়ার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু দেশবিদেশের সাত শত লোককে তিনি একত্রে ডুবাইয়া দয়ার পরিচয় না দিলেও, আজ আমি এই প্রসঙ্গের অন্তরালে, তাঁহার অসীম দয়ার আর যে এক পরিচয় পাইয়াছি, তাহার মীমাংসা কিরূপে হইবে?" আমার প্রতি তিনি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন মাত্র। তাঁহার শোকের মাত্রা বৃদ্ধি পাইল। আমি পুনরায় বলিলাম "বাঙ্গালাদেশের সাত শত লোক মরিল, তাহাদের কেহই আপনার আত্মীয়-স্বজন নহে, অসংখ্য জীবে জগৎ পূর্ণ, আপনি কেন এদের জন্য কাঁদিয়া আকুল? বাদুড়বাগানের এই গৃহে যে হৃদয় পরদুঃখে কাতর হইয়া মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত করিয়াছে, সে হৃদয় কি আপনি নিজে গড়িয়া তুলিয়াছেন? এ হৃদয়-পারাবারে উত্থিত তরঙ্গ-তুফানের ভিতর ভগবানের অসীম করুণার সাক্ষ্য পাইয়া আমার হৃদয় শান্তি লাভ করিল। আপনার এ হৃদয় আপনি গড়েন নাই, তাঁহারই গড়া হৃদয় আজ মাতৃস্নেহে উথলিয়া উঠিয়াছে।" আর একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন বটে, কিন্তু এবার সে দৃষ্টি তত তীব্র নহে। তাহার পর ধীরে ধীরে শান্তভাব ধারণ করিয়া বলিলেন "এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই।"

সন ১২৭৪ সালে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা প্রদেশে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষে অসংখ্য নরনারী অনাহারে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, সেই সময় মেদিনীপুর বর্দ্ধমান বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় অন্নবিতরণ জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় গভর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া বাধ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের অন্নবিতরণ-পদ্ধতি তাঁহার মনের মত না হওয়াতে, এবং তাঁহার অসামান্য দানশীলতার সংবাদ তাঁহার জন্মস্থান বীরসিংহের চারি পার্শ্বে প্রচারিত থাকায় অনাহারক্লিষ্ট অসংখ্য স্ত্রীপুরুষ তাঁহার গ্রাম্য ভবনে অন্নার্থে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করে। এই সংবাদ অবগত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সরকার-প্রতিষ্ঠিত অন্নছত্র দেখাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। তিনি "গৌরী সেনের" নাম লইয়া নিজ ভবনে "রাজেন্দ্র মল্লিকের" অতিথিশালা খুলিয়া দিয়াছিলেন। গরিব ব্রাহ্মণের সে সময়ের বুকের পাটা দেখিয়া,

সে সময়ের ধনকুবেরগণ ও সরকার বাহাদুরও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, তাই আদর-আপ্যায়নের দ্বারা সরকার বাহাদুর তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। পত্রখানি এই :—

"Sir, I have been instructed by the Secretary to the Government of Bengal, under orders of the 20th instant, to express to you the warm acknowledgment of Government for your generous exertions in relieving the poor during the recent scarcity in the Hoogly District."

বলা বাহুল্য যে, হুগলী, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের প্রান্তবর্ত্তী নানা পল্লীগ্রামের বিপন্ন লোকমণ্ডলী বীরসিংহে আশ্রয় লইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল। এই অন্নছত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতি সপ্তাহে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং সকল কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিতেন।

একদা তাঁহার ঐরূপ উপস্থিতি কালে তদীয় তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এক ইতরজাতীয়া রমণীর মাথায় পলা পলা তৈল সন্তর্পণে ঢালিয়া দিতেছিলেন; অভিপ্রায় এই যে, তাহাকে স্পর্শ করিতে না হয়। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের এ দৃশ্য অসহ্য হওয়াতে একটু উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন "শম্ভু, ও মাথায় অমন ক'রে তেল দেয় না, এই এম্নি ক'রে তেল দাও" বলিয়া সাগর হস্ত ভরিয়া তৈল লইয়া ঐ স্ত্রীলোকের রুক্ষ কেশরাশি নিজহস্তে ধরিয়া মাখাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "এই এমনি করিয়া গরিবের মাথায় তেল দিতে হয়!"

আর একটি ভয়ানক হৃদয়বিদারক ঘটনায় ঐ অন্নছত্রে সাগরের ভীষণ তরঙ্গ-তুফান সন্দর্শনে সে সময়ে লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। একটি স্ত্রীলোক কয়েক দিন উপবাসের পর সাগর-গৃহে উপস্থিত হইয়া অন্নের আশায় অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় অন্নবিতরণ-কার্য্য আরম্ভ হইলে পর, ঐ স্ত্রীলোক পাতে ভাত দেখিয়া আনন্দে দিশাহারা হইয়াছে! আনন্দে আটখানা হইয়া ঐ স্ত্রীলোকটি যেমন এক গ্রাস ভাত মুখে তুলিয়াছে, অমনি সেই ভাতের গ্রাসে দম আট্‌কাইয়া সে বেচারার মৃত্যু হইল, তার আর ভাত খাওয়া হইল না। এই সংবাদে অন্যত্র পর্য্যবেক্ষণরত সাগর অতি ব্যাকুল ভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া সেই সংজ্ঞা-তিরোহিত স্ত্রীলোকের চৈতন্যসম্পাদনে প্রাণপণ প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু সে বেচারার অনশন ক্লিষ্ট প্রাণ-পক্ষী পূর্ব্বেই দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়াছে! সে দিন সেই নারীদেহ ক্রোড়ে লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আক্ষেপোক্তি সহ অশ্রু অসংখ্য লোকের হৃদয়ে গভীর মর্ম্মবেদনার সঞ্চার করিয়াছিল। দীর্ঘ কাল পরেও তাঁহাকে এই নিদারুণ ঘটনা স্মরণ করিয়া দরবিগলিত ধারায় বক্ষ প্লাবিত করিতে দেখিয়াছি। বলিতেন, "সে বেচারা ভাত খেতে পেলে না, এই দুঃখ রাখিবার স্থান নাই, স্মরণ হইবা মাত্র প্রাণটা আকুল হয়, হৃদয়ে একটা বিষম যাতনার সঞ্চার হয়, সে ভাতটা খেলে না; পাতের ভাত পাতেই থাক্‌ল, তাহার খাওয়া হল না।"

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিভাগীরথী-ধারা প্রবাহিত করিয়া বাঙ্গালাদেশকে

ভক্তিতত্ত্বে মাতোয়ারা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন-প্রবাহে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া কত শত শত সাধু ভক্ত ভক্তি-পথের পথিক হইয়া ধন্য হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। তিনি যেমন বিধাতার রাজ-দরবারের এক প্রধান পুরুষ, ভক্তিস্রোত প্রবাহিত করিয়া নিজেকে ও দেশকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন; আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ঠিক সেইরূপ বিধাতার দয়ার বার্ত্তা লইয়া এ সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এইত গেল একদিক, এটা হৃদয়ের দিক্; আর একটা দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার দৃঢ়চিত্ততা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি কেমন প্রবল ও উজ্জ্বল ছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহের সময় কলিকাতার উত্তরাঞ্চলের শান্তি-রক্ষার জন্য যখন রাজাদেশে গোরা পাহারার আদেশ হইয়াছিল, তখন তাহাদের বিশ্রাম ও রাত্রি-যাপনের জন্য সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-কার্য্য কয়েক দিনের জন্য স্থগিত রাখিয়া ঐ বাটীতে সহর-রক্ষায় নিযুক্ত সৈন্যদিগকে স্থান দান করিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে বিষয়ের গুরুত্ব ও পূর্ব্বে অনুমতি লইবার সময়াভাব জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন এবং ঐ পত্রের এক প্রতিলিপি ছোটলাট বাহাদুরের নিকটে প্রেরণ করেন। হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময়োচিত সুবিবেচনার জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্রের উত্তর দেন, কিন্তু তরুণবয়স্ক ডিরেক্টর সাহেব কৈফিয়ৎ চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় সময়ের অল্পতা ও প্রয়োজনের গুরুত্ব স্মরণ করাইয়া উত্তর দিয়াছিলেন, এবং ডিরেক্টর সাহেবের পত্রের প্রতিলিপি ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবকে পাঠাইয়াছিলেন। ঐ ব্যাপারের শেষ পরিণাম গোপনে সম্পন্ন হইয়াছিল, হ্যালিডে সাহেব শুনিয়াছি বলিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কৈফিয়ৎ চাওয়া অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। এই ঘটনায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝিয়াছিলেন যে, আত্ম-মর্য্যাদা ও ইজ্জৎ বজায় রাখিয়া চাকুরি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে, তাই ত্বরায় কর্ম্ম-পরিত্যাগের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

স্বর্গীয় ন্যায়রত্ন মহাশয়কে বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সংস্কৃত কলেজে কর্ম্ম প্রাপ্তির সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য যখন বড় হিসাবদপ্তরে বড় চাকুরি পান, তখন এই আনন্দ-সংবাদ বহন করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় বিদ্যাসাগর-সদনে উপস্থিত হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন "কতটা তেল খরচ করিলে?" উত্তরে ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছিলেন, "লেখাপড়া-জানা ছেলে, তাই বেশী তেল খরচ করিতে হয় নাই।" উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন—"আজকাল তৈলদান ভিন্ন চাকুরী হওয়া ও চাকুরী রাখা একেবারে অসম্ভব হইয়াছে। উপযুক্ততার মর্য্যাদা অল্পলোকেই বুঝিয়া থাকে, তোমামোদের তৈল-দানে ত্রিলোক তৃপ্তি লাভ করে।" "মহামহোপাধ্যায়" পদের সৃষ্টিকালে ন্যায়রত্ন মহাশয় বিদ্যাসাগর-সদনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকেই গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বাগ্রে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি

দান করিতে ইচ্ছুক, এই সংবাদ দিবামাত্র সে মহাত্মা বলিয়াছিলেন, "দেশে যে স্বাধীনতা-টুকু ছিল, এবার তাহাও যাহাতে লোপ পায় তাহারই সদুপায় অবলম্বিত হইতেছে। উত্তম কাজ। বিষয়ী লোক সাংসারিক অবস্থায় উন্নতি ও পদমর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই আত্ম-বিক্রয় করিতেছে, অধঃপতিত হইলেও বাকি ছিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ। এবার তাদের স্বাধীনতা-টুকুও গেল। আমি আর এতে নেই; যা দিয়েছে, তাই খসিয়ে নিলে বাঁচি। তোমাদের এখন অনেক আশা-ভরসা আছে তোমরা নাও গে, আমি ওতে নাই।" ইনিই আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথম বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠান হয়, তখন সে অনুষ্ঠান সভায় জয়-নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গের অসংখ্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং রামগোপাল ঘোষ, হর-চন্দ্র ঘোষ হইতে আরম্ভ করিয়া তদানীন্তন বঙ্গের সকল শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে যখন ক্রমে দেশের নানাস্থানে বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকটি বন্ধু পরিবেষ্টিত হইয়াই এ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, ক্রমে বন্ধুরাও গা ঢাকা দিয়াছিলেন। এমন সময় একদা জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন "ঈশ্বর! এখন দেশের লোক কোথায়?" উপযুক্ত ছাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পূজনীয় গুরুদেবের বাক্যের উত্তরে বলিয়াছিলেন "এরা সব মায়ের ছেলে, মায়ের কোলে গিয়া বসিয়া নিরাপদ হইয়াছে আর আমি বাপের ব্যাটা তাই হা'ল ছাড়িতে পারি নাই।"

একদা বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকটা বড় বড় আঁব কিনিয়া নিজহস্তে লইয়া গৃহে আসিতেছিলেন, তাঁহার কোন এক সম্ভ্রান্ত বন্ধু পথে দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পথান্তর অবলম্বন করিতে যাইতেছিলেন, পাছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সম্মুখে আঁব হাতে অপ্রস্তুত হন! বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা বুঝিয়া ত্বরায় তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন "কারো চুরি করি নাই, নিজের পয়সায় কিনিয়া নিজেই ঘরে নিয়ে যাচ্চি, এতে তোমার এত লজ্জা কেন? পাছে দেখা হয় এই ভয়ে পলাইতেছ, আমি পরের বোঝা বইতেও কুণ্ঠাবোধ করি না, জেনে রাখ।"

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য ও জাতীয় জীবন

মানুষকে বুঝিতে হইলে, তাহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়, তাহার মন বুঝিতে হয়। জাতিকে বুঝিতে হইলে, তাহার সাহিত্য বুঝিতে হয়, কারণ সাহিত্যই জাতীয় জীবনের অভ্রান্ত ইতিহাস। মানুষ তাহার রচনার মধ্যে এবং সমাজ তাহার সাহিত্যে যেমন, এমন আর কিছুতেই অত সহজে ধরা দেয় না। এখানে আত্মগোপনের সহস্র চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া যায়! তাহার কারণ সাহিত্য মানবের আজীবনের সঙ্গী। সাহিত্যের সহিত তাহার জাতীয় উন্নতি অবনতির নিত্য সম্বন্ধ। বিষয়টি যে পরিমাণে পুরাতন, তদপেক্ষাও গুরুতর, স্বাধীন চিন্তার অনুকূল এবং জটিল। আরও জটিল হইয়াছে সাহিত্য বস্তুটি কি তাহার ব্যাখ্যায় সাহিত্যের প্রতিশব্দ নাই, সহজবোধ্য সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ অর্থবাচক সংজ্ঞা নাই; ব্যাখ্যা বিষয়ে পণ্ডিতগণের ঐক্যমত নাই এবং কোথায় ইহার আরম্ভ ও কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে তাহারও সীমারেখা টানিবার উপায় নাই। মতভেদে ইহা শব্দশাস্ত্র বা কাব্যশাস্ত্র; কাহার মতে যাহা কিছু রচনাবদ্ধ ও লিখিত হয় তাহাই সাহিত্য। আলঙ্কারিক বলেন—কাব্য, কবিতা, গণিত, জ্যোতিষ, কর্ম্মশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, জ্ঞান-শাস্ত্র ইত্যাদি সমস্তই মোটের উপর সাহিত্যেরই অধিকারাধীন। কবি এই ব্যাখ্যার নীরসতা দূর করিয়া বলিলেন "সাহিত্য অর্থে একত্র থাকিবার ভাব, মানবের সহিত থাকিবার ভাব, মানবকে স্পর্শ করা, মানবকে অনুভব করা। সাহিত্য অর্থাৎ হৃদয় মিলন, হৃদয়-মিলন উপলক্ষে বাজে কথা এবং মুখোমুখি, চাহাচাহি, কোলাকুলি, সাহিত্যও এইরূপ বিকাশ এবং স্ফূর্তি মাত্র। আনন্দই তাহার আদি, অন্ত, মধ্য; আনন্দই তাহার কারণ, এবং আনন্দই তাহার উদ্দেশ্য।"* কাহারও মতে বাল্মীকি, হোমর, কালিদাস, শেকস্পীয়র, গেটে, ড্যান্টে, এমার্সন, কার্লাইল, মধু বঙ্কিম, হেম, রবি লইয়াই সাহিত্য; কেহ সাহিত্যের ভিতর বার্ক, বেকন হইতে নিউটন, টিণ্ডাল থর্নহিলকে স্থান দিতে প্রস্তুত, কিন্তু কেহ আবার বৈজ্ঞানিক টিণ্ডাল থর্নহিলকে সাহিত্যিকের আসন দিতে নারাজ। সাধারণ সাহিত্য ও বিশুদ্ধ সাহিত্যই ইহাদের আলোচনার বিষয়ীভূত, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ রচনাকে সাহিত্য বলিয়া ইঁহারা গণ্য করেন না। সত্য কথা—মানুষ যখন মনুষ্যত্বের লক্ষণ হইতে বঞ্চিত হয়, তখন তাহাকে 'মানুষের মত মানুষ' কেহই বলে না, সে মানুষের হাত পা লইয়া এবং মানুষের চর্ম্মাবৃত হইয়াও সমাজে 'অমানুষ' বলিয়া অবজ্ঞাত হইয়া থাকে। মানুষের নিত্যসঙ্গী তাহার সাহিত্যও এই নিয়ম-বর্জ্জিত নহে। শুদ্ধ সাধারণ সাহিত্য (general literature) ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যই (Scientific literature) নহে; আমরা দেখিতে পাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই সাহিত্যের অধিকার। আমরা ঐতিহাসিক সাহিত্য (historical literature),

* রবীন্দ্রনাথ।

কলা-সাহিত্য (artistic literature), রাষ্ট্রনৈতিক সাহিত্য (political literature) ইত্যাদি বহুবিধ বিশেষণে সাহিত্যকে বিশেষিত করিয়া থাকি। এ সকলও সাহিত্য, আবার বক্তার বক্তৃতা, ভক্তের প্রার্থনা, আর্ত্তের বিলাপ, হতাশের আক্ষেপ, প্রেমিকের প্রেমালাপ—এ সকলও সাহিত্য। আমরা একখানি চিত্র বা একটী মর্ম্মর-মূর্ত্তিকে কাব্য বলি এবং চিত্রশিল্পী বা ভাস্করকে কবি বলিয়া থাকি। আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে মহাকাব্য এবং বিশ্বপতিকে আদিকবি বলিয়া তৃপ্তিলাভ করি। আদিকবি বিশ্বশিল্পী তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া যেমন প্রতিভাত হন, মানবও তাহার কাব্য, শিল্প এবং এক কথায় তাহার জাতীয়-দর্পণ সাহিত্যের মধ্য দিয়া, সেইরূপ প্রতিবিম্বিত হয়। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই কোন জাতি যুগযুগান্তরের পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া আসিতে তাহার পূর্ব্ব সংস্কারের ও ঐতিহ্যের খেই হারাইয়া ফেলিলে তাহাকে তাহার পুরাতন সাহিত্য হাতড়াইতে হয়। এবং সেই সূত্র ধরিয়া পুনরায় অগ্রসর হইলে সেই জাতিকে আবার খুঁজিয়া পাওয়া যায়। হিন্দুজাতিরও অবস্থা তাহাই ঘটিয়াছে। তাহারই ফলে যে সে ক্রমে দুর্ব্বল ও স্থানচ্যুত হইতেছিল এতদিন সে তাহা জানিতে পারে নাই। সে অধঃপতনের বিবিধ কারণের মধ্যে হিন্দুর জাতীয় সাহিত্যের প্রতি উপেক্ষা অন্যতম। বহু শতাব্দীর অপমান মাথায় বহিতে বহিতে, ঘরে বাহিরে লাঞ্ছিত হইতে হইতে এক্ষণে এই প্রাচীন জাতির অভিমানে আঘাত লাগিয়াছে। চতুর্দ্দিকে অগ্রসর-নীতি, সম্প্রসারণ-নীতি, সার্ব্বজনিক উন্নতি ও আত্মসম্মানের যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে তৎপ্রতি আর্য্যভারত যতই মুখ তুলিয়া চোখ চাহিয়া দেখিতেছে, ততই যেন আপনার দীনতায় হীনতায় মর্ম্মে মরিয়া যাইতেছে। আঁতে ঘা লাগিয়াছে বলিয়াই আজ ভারতবাসী আপনার সাহিত্যের মধ্যে ঐতিহ্যের খেই ধরিয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়াছে। পূর্ব্ব দিকের সাহিত্য-পরিষৎ, উত্তর-পশ্চিমের নাগরী-প্রচারিণী সভা, পঞ্জাবের গুরুকুল এবং হিন্দু সভা, দক্ষিণের আন্ধ্রসম্মিলন, উৎকল সাহিত্য-সমাজ প্রভৃতিতে তাহার বোধন বসিয়াছে। আমরা যেন শুনিতেছি এই সংস্কৃতমাতৃক আর্য্যভারতের হৃদয়তন্ত্রী একই সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। একদিন যে জাতির সাহিত্য কর্ম্মযোগীর হোমশিখায় আলোকিত, যজ্ঞধূমে সুরভিত এবং ওঙ্কার-শব্দে প্রতিধ্বনিত ছিল; যাহা একসময় রাজযোগীর শাসনে ও পালনে বীরহুঙ্কারে ও অস্ত্রঝনৎকারে, প্রতাপ এবং ঐশ্বর্য্যে গৌরবান্বিত হইয়াছিল, যে সাহিত্য ভক্তিযোগ সাধকের বিনয়বিলুণ্ঠনে, গদ্‌গদভাবে, নৃত্যকলায় ও রসলীলায় উপভোগ্য এবং বৈচিত্র্যময় হইয়া উঠিয়াছিল, যাহা কঠোর কর্ত্তব্য ও নিষ্কাম ধর্ম্মের গীতায় একদিন মুখরিত ছিল, ভারতবাসী কি সেই সাহিত্যের মধ্যে পুনরায় আপনাকে খুঁজিতেছে? কিন্তু নকল সূত্র, কল্পিত সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, ধীর স্থিরভাবে জাতীয় জীবনের মূল সূত্রটারই অনুসরণ করিতে হইবে। "ধর্ম্মোন্নতি ব্যতীত জাতীয় উন্নতি অসম্ভব।" সকল দেশের সকল মনীষীরই এই মত। তাঁহারা জগতের সকল জাতির ইতিহাস মন্থন করিয়া এই সত্য লাভ করিয়াছেন যে, ধর্ম্ম-

বিরহিত জাতি হয় ভীরু, মিথ্যাচারী, জুগুপ্সিত, না হয় নির্ভয়, যথেচ্ছাচারী, ক্রূরকর্ম্মা, দুর্বিনীত এবং স্খলিতগতি। তাহা হয় পতিত, না হয় পতনোন্মুখ এবং উভয়স্থলেই পরাধীন। তাহাকে উঠিতে হইলে এবং উঠিয়া দাঁড়াইতে হইলে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করিবার শক্তি পাইতে হইলে, অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল একমাত্র ধর্ম্মই তাহার অবলম্বন। এই ধর্ম্মের স্বরূপ কি, ইহা কোন্ সম্প্রদায়গত হওয়া আবশ্যক, কোন্‌টী সত্যধর্ম্ম ইত্যাদি লইয়া বিচার করিলে এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্যা ভেদ করিয়া নানা মুনির নানা মত হইতে খাঁটী ধর্ম্ম বাছিয়া লইতে চেষ্টা করিলে, কখনও যে সে বিতর্কের শেষ, বৈষম্যের শান্তি ও সন্দেহের সমাধান হইবে তাহার আশা নাই। ত্রিগুণাত্মিকাপ্রকৃতিগত নরনারীর সকলেই যে এক সম্প্রদায়ভুক্ত হইবে তাহা আশা করা যায় না। কিন্তু তাহার ধর্ম্ম যে মূর্ত্তিতে তাহার হৃদয়ে প্রতিভাত হউক না তাহা তাহার স্বধর্ম্ম হওয়াই চাই। তাহা পরধর্ম্ম অর্থাৎ অমানুষের ধর্ম্ম না হয়। তাহা পশু বা পিশাচের ধর্ম্ম না হয়। মানুষ যদি মানুষের ধর্ম্ম পায় তাহা হইলে তাহার জাতি নিশ্চয়ই রক্ষিত হইবে, সমুন্নত হইবে। মানবের এই রক্ষাকবচ মেকি হইলে চলিবে না, ইহা সিদ্ধকবচ হওয়াই চাই। আর্য্যভারত যখন উন্নত ও স্বস্থানে অবস্থিত ছিল, তখন এই মানবধর্ম্ম তাহার ছিল। তাহার লক্ষণ ধর্ম্মের প্রাণ চরিত্র তাহাতে ছিল। এই চরিত্র ছিল বলিয়াই জাতীয় জীবন অক্ষুণ্ণ ছিল এবং সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও নানা মুনির নানা মত কুফল প্রসব করে নাই। যেখানে এই ধর্ম্মের সূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, এখন সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইতে হইবে, এবং সেইস্থান হইতেই খেই ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তাই বলিতেছি নকল বা কল্পিত সূত্র যেন হাতে না পড়ে। হারাণ খেই ধরিতে হইলে জাতীয় সাহিত্য ব্যতীত আর উপায় নাই। তাহাকে জাগাইয়া, তাহাকে উঠাইয়া, তাহারই হাত ধরিয়া উঠিতে হইবে। সাহিত্যকে কেন এমন করিয়া ধরিতে হইবে? কারণ, সাহিত্য এই হারাণ খেই ধরিয়া রাখিয়াছে, সাহিত্য এই সমগ্র জাতিটীর চরিত্র ও ধর্ম্ম এমন কি তাহার ধারাবাহিক জীবনটীই ধরিয়া রাখিয়াছে। এখানে ধর্ম্মের সহিত সাহিত্যের মিলন; এখানেই সাহিত্যের সহিত জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধ এবং ইহাই মানবের পুণ্য প্রয়াগ।

জাতি ধর্ম্মপ্রাণ ও চরিত্রবান্ না হইলে, তাহার সাহিত্যও যে শক্তিশালী হয় না তাহার কারণ সাহিত্য জাতীয় সৃষ্টি। পক্ষান্তরে শক্তিহীন সাহিত্য বীর্য্যবান্ উন্নত জাতির সৃষ্টি করে না, কারণ সাহিত্য আবার জাতীয় উন্নতির প্রবর্ত্তক। ভ্রষ্টগৌরব, নষ্টশক্তি, ধর্ম্মহীন জাতি, জাতীয় সাহিত্যে সমুন্নত আদর্শ অভাবে পুনরুত্থান করিতে পারে না। ইহা ইতিহাসের কথা। জগতের নানাস্থানে এই সত্য সপ্রমাণ হইয়াছে, এবং সাহিত্যে তাহার নিদর্শন আছে। প্রাচীন ভারতের রাজা ও ভূস্বামিগণের ন্যায় ফ্রান্সের অধিপতি চতুর্দ্দশ লুই স্বদেশের উন্নতি-সাধনার্থ কিরূপ প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে ভূসম্পত্তি, অর্থ ও সম্মান কিরূপ

মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা পান নাই। অর্থে আর সব কেনা যায়, কিন্তু খাঁটি মানুষ কেনা যায় না। লুইর অর্থপুষ্ট লেখক সম্প্রদায় ফ্রান্সে যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিলেন, তাহা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তোষামোদপূর্ণ এবং অতীব অধম। তাহাতে সমগ্র য়ুরোপে সুসভ্য ফ্রান্সই হীনবল হইয়া পড়ে, তথায় উদ্যম, সন্তোষ ও স্বাধীন চিন্তা তিরোহিত হয়। ফ্রান্সের রাজতন্ত্র বিকৃত হইয়া পড়ে এবং রক্ষকগণই ভক্ষক হইয়া উৎপীড়ন ও লুণ্ঠন দ্বারা রাজকোষ শূন্যপ্রায় করিয়া ফেলে ; প্রজাকুলের কষ্টের একশেষ হয়। অর্দ্ধশতাব্দী এইরূপ প্রশ্রয় পাইয়া অবশেষে চতুর্দ্দশ লুইর পরবর্ত্তী রাজদ্বয়ের সময় ফ্রান্স সম্পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। ডেকার্টের পর ও চতুর্দ্দশ লুইর পূর্ব্বে প্রায় ৬০ বৎসর মধ্যে স্বাধীনচিত্ত লেখক একজনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। ষোড়শ লুইর শাসনকালে ফ্রান্সে অনাচার ও অত্যাচার এরূপ ভীষণভাব ধারণ করে যে প্রতিমুহূর্ত্তেই বিজাতীয় আক্রমণের বিভীষিকা প্রত্যেক বিজ্ঞ এবং বহুদর্শী ফরাসীর হৃদয় ব্যাকুল করিয়া তোলে এবং তাহারই ফলে ১৮০০ খৃঃ অব্দে মান্দেভিলি (Mandeville), মিরাবো (Mirabeau), ভল্টেয়ার (Voltair) প্রমুখ প্রায় ২০০ 'মানুষের মত মানুষ' অথবা মহাপুরুষ ইংলণ্ডে গমন করেন। তখন ইংরাজী সাহিত্য জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত, স্বাধীন চিন্তায় পূর্ণ। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবর্ত্তিত যাবতীয় উন্নতির সেই সূত্রোন্মেষ। গৃহবিচ্ছেদ, ধর্ম্মবিপ্লব, রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া তখন শান্তিরাজ্যের স্থাপনা হইয়াছে, তথায় উন্নত সাহিত্যের সুফল ফলিয়াছে। ফ্রান্সের উক্ত মনীষিগণ সেই আদর্শ সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া তাহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তাঁহাদের জাতীয় সাহিত্যে দেশানুরাগ ও স্বাধীন চিন্তার বীজ বপন করেন। তাহার ফলে অনেকেই নিগৃহীত হইয়াছিলেন, কিন্তু কারাগৃহ, অর্থদণ্ড, নির্ব্বাসন প্রভৃতি তুচ্ছ করিয়া ডিডেরট (Diderot) এবং মার্মণ্টেল্ (Marmontel) প্রমুখ লেখকগণ যে জাতীয় আশার বসন্তরাগস্বরূপ, প্রপীড়িতের ভরসাস্বরূপ বাড়বাগ্নি-সদৃশ বীর্য্যাত্মক মহাপ্রলয়কারী সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারই কেন্দ্রীভূত বহ্নি প্রত্যেক ফরাসীর শিরায় শিরায়, প্রতি অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়া তাহাদের বহুকাল-পোষিত কুসংস্কার ভস্মীভূত করিয়া শান্তি-রাজ্যের সংস্থাপন করে। অদ্যাবধি ফ্রান্স তাহার সুফল ভোগ করিতেছে। এই সংস্কারকারী সাহিত্য স্রষ্টা ভল্টেয়ার (Voltair), মিরাবো (Mirabeau), ডেকার্টে (Descartes) প্যাসক্যাল (Pascal) এবং গ্যাসেঁদি (Gasendi) প্রভৃতি অমর হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু চতুর্দ্দশ লুইর সমসাময়িক সাহিত্যরথী লা-সাপ্‌ল্ (La Chappelle), লা-মটী (La Mottee) এবং ড্যানকোর্ট (Dancourt) প্রভৃতির নাম আজ বিস্মৃতি-সলিলে ডুবিয়া গিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ফ্রান্সে সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী জাতির উন্নতির আরম্ভ। ইহার শতাব্দী পূর্ব্বে স্পেনে জাতীয় সাহিত্যই ছিল না ; থাকিলেও তাহা অধীত এবং আলোচিত হইত না। স্পেনের উচ্চ-শ্রেণীর

মধ্যেও তখন সাহিত্য-চর্চ্চার অভাব ছিল। সাধারণ জনগণ অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া ছিল। ডিউক-ডি-সেণ্ট সাইমন্ (Duke De Saint Simon) বলেন "স্পেনে তখন বিজ্ঞান চর্চ্চা অপরাধ এবং মূর্খতাই ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত।" তখনকার স্পেনীয় সাহিত্য মন্থন করিয়াও বিশেষজ্ঞগণ ডি-টর্রি (De Torres) এবং ফীজু (Feijoo) ব্যতীত দেশীয় লেখক খুঁজিয়া পান নাই। ষষ্ঠ ফার্দ্দিনান্দ্ (Ferdinand VI)এর রাজত্বকালে খ্যাতনামা যুসেন্দা (Eusenda) স্বজাতির এই দুর্দ্দশা দেখিয়া বিস্মিত হন এবং তৎপ্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার প্রজ্ঞাপূর্ণ পরামর্শে এবং নবশক্তি-সঞ্চারকারী উৎসাহ-বাক্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্পেনরাজ কতিপয় প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে ফ্রান্স এবং হল্যাণ্ডে প্রেরণ করেন। তাঁহারা বিদেশের উন্নত সাহিত্যের মহান্ আদর্শ স্বদেশের সাহিত্যে প্রতিফলিত করেন। ফলে, স্পেনে সাহিত্যানুরাগ জন্মে এবং অবনত স্পেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই উন্নত হয়। ষষ্ঠ ফার্দ্দিনান্দ, প্রখ্যাতনামা ফিলিপ্ এবং তৃতীয় চার্লস্এর রাজত্বকালে স্পেনের জাতীয় সাহিত্য নিজে উন্নত হইয়া স্পেন জাতিকে সমুন্নত করিয়াছিল। কিন্তু চতুর্থ চার্লস্ ছিলেন স্বয়ং মূর্খ, সাহিত্যে বীতরাগ এবং সাহিত্যিকগণের নিরুৎসাহদাতা। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার সময়ের অশেষগুণশালী আরাণ্ডা (Aranda), ফ্লরিডা ব্লাঙ্কা (Florida Blanca) এবং কোবার্রাস্ (Cobarrus) প্রমুখ মনস্বী সংস্কারকগণকে কারাগৃহে নিক্ষেপ করত দেশে স্বাধীন চিন্তার পথ এককালে রুদ্ধ করিয়া দেন। ফলে সাহিত্যশূন্য স্পেন, উপদেশ, উৎসাহ, আন্দোলন, অনুশীলন ও আদর্শ অভাবে, পুনর্ব্বার অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত এবং অধোগতি প্রাপ্ত হয়। একই অবস্থায় ফ্রান্সের কারাগৃহ হইতে যে জ্বলন্ত সাহিত্য বাড়বাগ্নিগর্ভ অম্বুরাশির ন্যায় উচ্ছলিত হইয়া সাধারণের হৃদয়ে ঘাতপ্রতিঘাত করিবার অবসর পাইয়াছিল, স্পেনের বন্দীগৃহ হইতে সেরূপ কিছুই হইতে পায় নাই। কেবলমাত্র ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে বা স্পেনে নহে, সাহিত্য-শক্তির এই লীলা সর্ব্বকালে এবং জগতের সর্ব্বত্রই অভিনীত হইতেছে। সাহিত্যই জাতিকে গড়ে, আবার সাহিত্যই তাহাকে ভাঙ্গে। কাহাকেও সে উন্নতির উচ্চমঞ্চে তোলে আবার তাহাকেই অবনতির অতল-তলে ফেলিয়া থাকে। ইতিহাসই বলিতেছে এমন যে শক্তিশালী সাহিত্য ইহা জনসাধারণের উপযোগী হওয়াই চাই, সাহিত্যকে কেবল সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের ঘরের জিনিস বা কেবল শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের আভিজাত্যজ্ঞাপক এবং ধনীদিগের বিলাসের বস্তু এবং আনন্দবাজারের পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিলে চলিবে না। ইহা বিক্রয়ের বস্তু নহে। ইহাকে দেশের জল-বায়ু, আলোক এবং উত্তাপের মত সর্ব্বসাধারণের অনায়াসলভ্য করিয়া দিতে হইবে। ধনীর গৃহে তাহার জন্ম হইলেও দরিদ্রের কুটীরে তাহাকে পৌছাইয়া দিতে হইবে। দীনের গৃহে তাহার জন্ম হইলেও তাহা ধনীর মাথার মণি হইবে। উন্নত চিন্তা, মহান্ আদর্শ কেবল মনস্বিগণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। যাহাদের লইয়া উঠিতে হইবে এবং যাহারা উঠিলে জাতীয় উন্নতি হইল বলিতে পারা যাইবে,

তাহারা যতক্ষণ সে আদর্শ ধরিতে না পারিবে, মনস্বীদিগের উদ্দেশ্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ সকল চেষ্টা সকল কল্পনাই ব্যর্থ হইবে। সাহিত্য কেবল উন্নত হইলেই হয় না, বিদেশ হইতে আনীত সহস্রগুণে উন্নত সাহিত্যেও কাজ হয় না, কারণ বিদেশীর পক্ষে তাহা নির্জ্জীব। তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাকে জীবন্ত চরিত্র-সংগঠক করিয়া তুলিতে হইলে, তাহাকে মাতৃভাষার ভিতর দিয়া, জাতীয় ঐতিহ্য ও শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাধারণের সম্পত্তি করিয়া দিতে হইবে। যাহা জাতীয়ত্বের লক্ষণ-বর্জ্জিত, তাহা জাতীয় সাহিত্যই নহে, সুতরাং তাহা শক্তিশালী সাহিত্যও নহে। সাধারণের উপযোগী সাহিত্যের অভাবেই ভারত, গ্রীস, ইতালী, জর্ম্মাণী প্রভৃতি বহুদিন ধরিয়া পুরাতন শিক্ষার সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই; ইংলণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী স্কট্‌লাণ্ড অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এবং সমগ্র য়ুরোপ পঞ্চশত বর্ষ অর্থাৎ ৬ষ্ঠ হইতে ১০ম শতাব্দী পর্য্যন্ত সভ্য জগতে অনাদৃত হইয়াছিল। ইতালীয় ভাষা ল্যাটীন তখন য়ুরোপের সকল দেশেই সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হওয়ায় একমাত্র ইতালীতেই জগদ্বিখ্যাত ভার্জ্জিল (Virgil), হোরেস (Horace), দান্তে (Dante) এবং ট্যাসো (Tasso) প্রভৃতি তাৎকালীন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক ও কবিদের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইংলণ্ডে নর্ম্মান্ ফ্রেঞ্চ্ এবং জর্ম্মাণিতে ফ্রেঞ্চ্ যখন সাহিত্যের ভাষা ছিল, তখন তত্তদ্দেশে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সেবক, আদর্শ নায়ক এক-জনও জন্মগ্রহণ করেন নাই; কিন্তু জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন-যুগে সর্ব্বত্রই উচ্চ-তম শ্রেণীর কবি ও উচ্চ-সাহিত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে রাজা তৃতীয় এডবার্ডের শাসনকালের মধ্য ল্যাটিনের প্রসার ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া শুদ্ধ পুরোহিত ও পণ্ডিতমণ্ডলীতে, ফরাসী অভিজাত-সম্প্রদায়ে এবং ইংরাজী জনসাধারণে প্রচলিত হইয়াছিল। ফ্রান্স, স্পেন, জর্ম্মাণি প্রভৃতি দেশেও ক্রমে দেশ-ভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের প্রসার সাধারণের মধ্যে হইতে থাকে। সাধারণের সম্পত্তি জনসাধারণের হস্তে পতিত হওয়ায়, ইংলণ্ডে স্যার্ জন মান্দেভিলী (Sir John Mandevillee), ল্যাংল্যাণ্ড (Langland), চসার (Chaucer) প্রমুখ সাহিত্যাচার্য্যগণের অভ্যুদয় হয় এবং তথায় শেক্‌স্‌পীয়র (Shakespeare) ও মিল্টন (Milton), ফ্রান্সে কর্নীল্ (Carnele) ও ভল্টেয়ার (Voltair), স্পেনে কল্‌ডরনন্ (Caldernon) এবং জর্ম্মাণিতে গেটেকে (Goethe) পাইয়া জগৎ ধন্য হয়। ভারতে জাতীয় সাহিত্যের অবনতির সঙ্গে জাতীয় জীবনের অবনতি ঘটিয়াছিল বলিয়াই হউক অথবা জাতীয় চরিত্রের অবনতির সঙ্গে জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতের অবসাদ ও মৃতসাহিত্যরূপে তাহার পরিণতি প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল বলিয়াই হউক, বিভিন্ন প্রদেশের কথ্য প্রাকৃতে প্রাদেশিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে থাকে। সেই সকল সাহিত্য—হিন্দী, বাঙ্গালা, মারাঠী, উড়িয়া প্রভৃতি—সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় হিমালয়ের উচ্চতা, আকাশের বিশালতা ও সাগরের গভীরতা না পাইলেও সেই প্রাচীন সাহিত্য-ধৃত জাতীয়ত্ব সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছিল। শুদ্ধ এই কারণেই কপিল, কণাদ, ব্যাস, বাল্মীকি,

কালিদাস, ভবভূতির দেশে অন্ততঃ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীদাস এবং তুলসী তুকারাম প্রমুখ কবিগণের অভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে, জাতীয় জীবনের সম্পূর্ণ অবসাদের যুগে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা লুপ্তপ্রায় হইলে, সংস্কৃত পণ্ডিত-মণ্ডলীতে, রাজভাষা ফারসী ও পরে ইংরাজী অভিজাত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ে, এবং বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষা কেবল কথ্যরূপে অশিক্ষিত ও নারী সমাজে আবদ্ধ হইয়া যায়। বাঙ্গালার সেই দুর্দ্দিনে বঙ্গভাষায় লিখিতে পড়িতে এমন কি তাহাকে ভদ্রসমাজে ব্যবহার করিতেও শিক্ষিতেরা লজ্জা বোধ করিতেন! কিন্তু সে হাওয়া ফিরিয়াছে, যাহারা তাহা ফিরাইয়াছেন—রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই,—যাঁহারা বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব এবং সাধারণীর যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন তাঁহারা বর্ত্তমান বঙ্গভাষার জনক জাতীয় সাহিত্যের স্রষ্টা। তাঁহারা সকলেই য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুরাগী, প্রায় সকলেই য়ুরোপীয় জীবন্ত সাহিত্যে অনুপ্রাণিত, কিন্তু কেহই জাতীয় ঐতিহ্যের ভাণ্ডার সংস্কৃত সাহিত্যকে ছাড়েন নাই। ঐ প্রাচীন সাহিত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিতে হইবে এবং য়ুরোপের জীবন্ত জলন্ত সাহিত্যকেও ছাড়া হইবে না; তবেই বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য, চতুর্দ্দিকের উচ্চতম ভাব, কল্পনা ও সত্যসমূহ আত্মস্থ করিয়া সমুন্নত হইবে। বাহির হইতে বন্যার জল কেহই আনিতে পরামর্শ দেন না, পাছে বন্যার জল ঘরে ঢুকিয়া ঘরোয়া জলটুকুও বাহির করিয়া লইয়া যায়। আমরা বড় ভাব-প্রবণ, আমরা ভাবের বন্যায় ভাসিয়া যাই, ভাবতরঙ্গে নাচি, আর জোয়ারের মুখে যাহা কিছু পাই, ভাঁটার মুখে সে সব ত বটেই, তাহা ছাড়া আমাদের যাহা ছিল তাহাও ভাসাইয়া দিয়া বসি। বাণের জলে তাই আমাদের ভয় এত বেশী। সুতরাং আমরা খাল কাটিয়া স্রোতের জল ধরিব। ভাসিয়াও যাইব না, ভাসাইয়াও দিব না। পাশ্চাত্য সাহিত্যের স্রোত খাল কাটিয়া আনিব, আর গাঙ্গের মুখে সংস্কৃত জাতীয় সাহিত্যের দৃঢ় বাঁধ বাঁধিব। যে ইতালীয় সাহিত্য এক সময় ইংলণ্ডের সাহিত্যকে ঢাকিয়া তাহার জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়াছিল, সেই ইতালীয় সাহিত্যই ইংরাজের জাতীয় উন্নতির অন্যতম কারণ স্বরূপ হইয়াছিল। আপনারা জানেন, রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় ইতালী হইতে, রাজ্ঞী এ্যানের সময় ফ্রান্স হইতে এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময় জর্ম্মাণি হইতে ধর্ম্ম, রাজনীতি এবং শিক্ষা-সংস্কারের খরস্রোত আসিয়া ইংরাজের জাতীয় সাহিত্যকে উত্তরোত্তর উন্নত, মার্জ্জিত, শক্তিশালী ও আদর্শস্থানীয় করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ, ইংরাজ আপন জাতীয়ত্ব হারায় নাই, আপনাদের ঐতিহ্য নষ্ট হইতে দেয় নাই। বাঙ্গালীর শুভদিন যে, আজি শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের চিত্ত পুরাতনের দিকে ধাবিত হইয়াছে। পুরাতনকে বাদ দিয়া নূতন গড়িয়া তোলা যায় না, এক্ষণে সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃতের চর্চ্চার সূত্রপাত হইয়াছে, আমাদের কোথায় কি ছিল, কোথায় কি চাপা পড়িয়া আছে, তৎসমুদয় টানিয়া বাহির করিবার

আগ্রহ জন্মিয়াছে। জীর্ণ-সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। যাহা সরস ছিল তাহাকে ভাল করিয়াই প্রকাশ করিবার এবং যাহা নীরস ছিল তাহাকে বাহির করিবার মত মার্জ্জিত করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়াছে। জাতিকে উন্নত করিতে হইলে এইরূপেই তাহার সম্মুখে একটী আদর্শ খাড়া করা কর্ত্তব্য। তাহাতে আত্মগ্লানি বা লজ্জা-সঙ্কোচ জন্মে না; তাহা আত্মসম্মান, কেবল আত্মনির্ভর, সাহস এবং শক্তির উৎস-স্বরূপই হয়।

উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে। অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্য চতুর্দ্দিকেই আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা বড় ভাব-প্রবণ। আমরা এই প্রাচ্য সংরক্ষণের ঝোঁকে যেন পাশ্চাত্য আলোকের আবশ্যকতা ভুলিয়া না যাই। কারণ আমাদের সব ছিল, আর আমরা সব জানি বলিয়া যদি একটা আদর্শ গড়িয়া তুলিতে যাই, তাহা হইলে তাহা একটা ফাঁকা আওয়াজে পর্য্যবসিত হইবে মাত্র। এখন, আমাদের প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের সম্মিলন এবং উভয়ের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান যাহাতে ঘটে তাহাই করিতে হইবে। তাহাদের বিজ্ঞান, সত্য জীবনীশক্তি আমাদের পাইতে হইবে, আমাদের ধর্ম্ম, দর্শন, সত্য, ও জীবনের আদর্শ তাহাদিগকে দান করিতে হইবে। সাহিত্যই ইহা সম্ভব করিয়া তুলিবে। বঙ্গ-সাহিত্যের ভিতর দিয়াই তাহার সূত্রপাতও হইয়াছে। কারণ, প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের সম্মিলন করাইয়া কবি মধুসূদন যাহা সম্ভব করিয়া গিয়াছেন; বঙ্কিম, কালী-প্রসন্ন, হেম, নবীন যাহা বাঙ্গালী সাধারণের জাতীয় সম্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, কবি রবীন্দ্রনাথ তাহা সাধারণের বাসনার বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। কবিবর স্বয়ং এক সময় যে বলিয়াছিলেন "পূর্ব্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্যসুর বাজিত, আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।" তিনি তাহার প্রমাণও দিয়াছেন। সাহিত্যের সহিত জাতিকে উন্নত করিতে হইলে, যাহা যাহা প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহার অনেকগুলি, এবং তাহার সকলগুলির বীজ সাহিত্যের মধ্য দিয়াই পাওয়া যায়, বাহিরের উন্নত জাতিসমূহের শ্রদ্ধাই তাহার অন্যতম এবং প্রথম। কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের প্রতি সভ্য জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তন এবং জাতীয় জীবনে নব জাগরণ আনয়ন করিয়াছেন। তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের মুখচোরা ভাব ঘুচাইয়া তাহাকে বিশ্বসভায় আপনার দাবী রুজু করিবার এবং প্রাপ্য আদায় করিয়া সম্মানের সহিত ঘরে ফিরিবার উপযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। জাতীয় জীবনের সকল বিভাগেই এইরূপ চেষ্টার প্রয়োজন আছে। স্বামী বিবেকানন্দ, ডাক্তার জগদীশচন্দ্র এবং প্রফুল্লচন্দ্রের দ্বারা তাহারও পথ প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু উহাই পর্য্যাপ্ত নহে, উহা আরম্ভ মাত্র, উহা সাহিত্যের সংযোগে জাতীয় উন্নতির উন্মেষ—চরম বা শেষ নহে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

প্রথম খণ্ড

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের সার :—

(প্রথম স্তর)

কিঞ্চিদধিক শত বর্ষ পূর্ব্বে ফ্রান্স মহাদেশের ফ্যাবেরোল পল্লীতে জীন ভ্যালজিন নামে এক দরিদ্র কাঠুরিয়া বাস করিত। সংসারে তাহার একমাত্র ভগিনী; বিধবা হওয়ার পর সাতটি পুত্র কন্যা লইয়া সে ভ্রাতার আশ্রয় লয়। —সমস্তদিন প্রাণপণে খাটিয়াও জীন সকলের পর্য্যাপ্ত আহার সংগ্রহ করিতে পারিত না; অতি কষ্টে দিন কাটিতেছিল।—তখন শীতকাল, তুষারপাতে চারিদিক আচ্ছন্ন, ব্যবসা আর চলে না। বুভুক্ষু শিশুরা আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল,—গৃহে এক টুকরা রুটীও নাই। সমস্তদিন জীন তাহাদের সে কাতর ধ্বনি শুনিল; শেষে, সন্ধ্যার সময়, উন্মত্তের ন্যায় বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল। সম্মুখেই রুটীর দোকান,—বুভুক্ষিতং কিং ন করোতি পাপম্—অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া দোকানের কাচ ভাঙ্গিয়া অমনি সে একখানা রুটী তুলিয়া লইয়া পলায়নপর হইল। দোকানী সতর্ক ছিল; সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ধরা পড়িয়া সেসনের বিচারে পাঁচ বৎসরের জন্য জীন গ্যালিতে নির্ব্বাসিত হইল। চার বৎসরের শেষে সে গ্যালি হইতে পলায়, ধরা পড়িয়া আরও তিন বৎসর; এবং তার পর উপর্য্যুপরি আরও তিনবার পলায়ন চেষ্টার অপরাধে ১১ বৎসর; সর্ব্বশুদ্ধ ১৯ বৎসর তার কারাবাস হয়।—তাহার প্রথম অপরাধ একখানি মাত্র রুটি চুরি! অশ্রুপ্লুত-করুণাপ্রার্থী মুখে, নিরাশাদগ্ধ প্রাণে কারাগারে সে প্রথম প্রবেশ করে;—মুক্তির দিনে তাহার সে চিত্ত প্রতিহিংসাদৃঢ় কঠোর পাষাণে, সে মূর্ত্তি একটা বিভীষিকার ছবিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। কাহার দোষ দিব? সমাজের, না তার? সমাজই কি এজন্য বেশী দায়ী নয়,—এ রসাতল কি তারই সৃষ্টি নয়? মুক্তির দিন কয়বৎসরের পারিশ্রমিক হিসাবে সে ১০৯ ফ্রাঙ্ক ১৫ স্যুস পাইল; তাহার হিসাবে কিন্তু আরও বেশী হইয়াছিল,—অবশ্য, সে ছুটীর দিনগুলা বাদ দেয় নাই। ক্ষুণ্ণ হইয়াই সে সে অর্থ গ্রহণ করিল। পর দিন পথে আসিতে আসিতে তাহার একটা দিনমজুরী জুটিল। কিন্তু সমস্তদিন প্রাণপণে খাটিয়া প্রাপ্যমজুরীর অর্দ্ধাংশ মাত্র সে পাইল। মেট শাসাইল,—কিছু বলিলে পুলিশে দিবে; তার হরিদ্রাবর্ণের ছাড়পত্র সে দেখিয়াছিল। কাজেই জীন আর কিছু বলিল না। মনে ভাবিল—'ভাল, সরকারও কিছু ডাকাতি করেছে, এখন এরা জনে জনে ডাকাতি করুক।' সংসারের উপর তাহার আক্রোশ বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। ইহার দুইদিন পরে সে সন্ধ্যার সময় ডি—নগরে প্রবেশ করে। তাহার সে রুক্ষ দানবের ন্যায় আকৃতি দেখিয়া সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সহরের কোন সরাই-খানাতেই তাহাকে ঠাঁই বা আহার্য্য দিল না। এক কৃষকের বাড়ীতে গেল, তাহাকে দেখিয়া সে গুলি করিতে আসিল; কুকুরের ঘরে আশ্রয় লইতে গেল, কুকুরও তাহাকে তাড়া করিয়া আসিল। নগর ছাড়িয়া তখন সে প্রান্তরে আসিয়া পড়িল। তৃণপুষ্পহীন অনন্ত প্রান্তর, দূরে পর্ব্বতের নির্ম্মম পাষাণস্তূপ;—আকাশ নক্ষত্রহীন, ঘন মেঘাচ্ছন্ন!—শঙ্কিত হইয়া নগরে ফিরিয়া সদর রাস্তায় একটা পাথরের বেঞ্চে সে শুইয়া পড়িল,—ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তখন তাহার শরীর অবসন্ন। শেষে, এক দয়ার্দ্র মহিলা তাহার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া, অদূরে তত্রত্য প্রধান ধর্ম্মযাজক বিয়েন্ভেনু মিরিয়েলের বাটী নির্দ্দেশ করিয়া আশ্রয়ের জন্য সেখানে যাইতে তাহাকে উপদেশ দিয়া গেলেন। বিয়েন্ভেনু মিরিয়েল দয়ার্দ্রচিত্ত, আত্মজয়ী, সদানন্দ ঋষিতুল্য পুরুষ ছিলেন। বাৎসরিক প্রচুর আয়ের সমস্তই দরিদ্রের জন্য এবং সৎকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া সামান্য আয়ে তিনি জীবন ধারণ করিতেন;—সংসারের মধ্যে তাঁহার এক ভগিনী ও বৃদ্ধা পরিচারিকা। তাঁহার দ্বার অর্থীদের জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। তাই জীন বাহির হইতে করাঘাত করিতেই প্রথা মত অভ্যন্তর হইতে আহ্বান আসিল "ভিতরে আসুন।" তখন

তাঁহারা নৈশভোজনে বসিয়াছিলেন। জীন তখন 'মরিয়া' হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যাখ্যাত হইবেই সে জানিত, তাই গৃহে প্রবেশ করিয়া একনিঃশ্বাসে সে আপনার সমস্ত পরিচয় দিয়া গেল। স্ত্রীলোকেরা ভীতিচকিত হইয়া উঠিল। মিরিয়েল, অশ্রুপূর্ণ চক্ষে তাহাকে বিশিষ্ট অভ্যাগতের ন্যায় সযত্নে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে আনিয়া বসাইলেন; তারপর তাহার সম্মানের জন্য রৌপ্যবাতিদান আনিয়া, রূপার থালিতে আহার্য্য পরিবেশন করিয়া আপন শয়নকক্ষ-সংলগ্ন অতিথি-অভ্যাগতের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে নূতন শয্যাস্তরণ বিছাইয়া তাহার শয়নের স্থান করিয়া দিলেন। জীন এত আদর যত্ন সম্মানে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তবে সংসারে করুণা সহানুভূতিও আছে?

গভীর রাত্রে অকস্মাৎ জীনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। শয়নকক্ষে আসিবার সময় পার্শ্বে মিরিয়েলের কক্ষে পরিচারিকাকে রূপার জিনিসগুলা আলমারিতে তুলিয়া রাখিতে সে দেখিয়াছিল। সেই গুলার প্রতি তাঁহার লোভ জাগিতেছিল। শেষে তাহার পশুভাব, পাপ-প্রবৃত্তিই বলবতী হইল;—মিরিয়েলের ও তাহার কক্ষের মধ্যে একটি মাত্র দ্বার,—তাহাও উন্মুক্ত ছিল। নিঃশব্দে বাসনাদি অপহরণ করিয়া পশ্চাতের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া সদর রাস্তায় পড়িয়া ছুটিয়া সে পলাইল। কিন্তু, দৈবের খেলা, পরদিন পুলিশের হস্তে ধৃত হইয়া মিরিয়েলের সম্মুখে আনীত হইল। মিরিয়েল প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া, জীন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ত্রস্তে রূপার বাতিদান দুইটা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—"ভাই, এ দু'টো ফেলে গিয়েছ কেন? এ দু'টোও যে তোমাকে দিয়েছি।" পুলিশ আপনাদের ভ্রম বুঝিয়া সঙ্কুচিত হইয়া কক্ষ ত্যাগ করিল। জীন—স্তম্ভিত নির্ব্বাক! মিরিয়েল বলিলেন—"ভাই, আজ থেকে তোমার নবজীবন, এ কথা মনে রেখো।"

সেখানে হইতে বাহির হইয়া সমস্ত দিন ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া জীন প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় পথের পার্শ্বে একটা ঝোপের ধারে অবসন্ন হৃদয়ে বসিয়া পড়িল। জারভিস নামে একটা হা-ঘরে বালক সেইপথ দিয়া আসিতেছিল; দৈবক্রমে একটা টাকা তাহার হাত হইতে গড়াইয়া জীনের পায়ের কাছে আসিয়া পড়িতেই জীন পা দিয়া সেটাকে চাপিয়া ধরিল। বালকের অনুনয়, ভ্রূকুটি, তিরস্কার কিছুই তাহার কাণে গেল না। সে তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কি ভাবিতেছিল,—তাহার চিত্তের কঠোরতা এবং মিরিয়েলের সে অপূর্ব্ব করুণা উভয়ের মধ্যে একটা প্রাণপণ সংগ্রাম চলিতেছিল। অন্যমনস্ক ভাবে তাই সে জারভিসকে তাড়া করিল; বালক সভয়ে ছুটিয়া পলাইল।—তারপর শীতানুভূতি হওয়ায় উঠিবার সময় সহসা সে রজতমুদ্রা দৃষ্টিপথে পড়িতেই আবছায়ার ন্যায় সকল কথা তাহার স্মরণ হইল। সর্পদষ্টের ন্যায় সন্ত্রস্ত হইয়া জীন তখনই বালকের অনুসরণ করিয়া ছুটিল। কিন্তু কোথায় সে? বহুচেষ্টাতেও তাহার সন্ধান মিলিল না। শেষ রাত্রে মিরিয়েলের বহির্ব্বাটীর দ্বারে নতজানু হইয়া বসিয়া দারুণ অনুশোচনায় অভাগা বহুক্ষণ ধরিয়া তপ্তাশ্রু বর্ষণ করিল। মিরিয়েলের করুণা ব্যর্থ হয় নাই।

(দ্বিতীয় স্তর)

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর আটবৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। যেখানে ক্ষুদ্র এক পল্লী ছিল, সেখানে এখন প্রকাণ্ড সহর বসিয়াছে। কত কল-কারখানা শ্রমজীবী লইয়া ম—সহর অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে কোথা হইতে কে একজন আসিয়া নূতন ভাবে চুড়ির ব্যবসা করিয়া, অত্যল্প সময়ের মধ্যে সে প্রদেশে যুগান্তর আনিয়া, নিজেও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কালক্রমে তিনি সেই প্রদেশের মেয়র বা শাসনকর্ত্তার পদে বৃত হন। সাধারণে তিনি ফাদার ম্যাডেলিন বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। ফ্যানটাইনের জন্মস্থান সেই পল্লীগ্রামে। যৌবনের প্রারম্ভে প্রতারকের কুহকে ভুলিয়া, আবাল্যের গৃহ ত্যাগ করিয়া বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায়ই ফ্যান থলোমিয়ের লালসা-বহ্নিতে আপনাকে উৎসর্গিত করে। শেষে পরিত্যক্তা হইয়া, শিশু কন্যা কসেটকে মণ্টফারমিলে মাসিক বন্দোবস্তে সরাইওয়ালা থেনেডিয়ারদের কাছে রাখিয়া, স্বগ্রামে সে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। শৈশব হইতে তাহারা সহরেই থাকিত, তাই সেখানে বহুকাল পরে

সৌভাগ্যক্রমে কেহ তাহাকে চিনিল না; ম্যাডেলিনের কারখানায় সে কাজ পাইল।—কয়মাস সুখে কাটিল। শেষে পরছিদ্রান্বেষীদের ষড়যন্ত্রে একদিন তাহার কলঙ্ক-কাহিনী প্রচারিত হইয়া পড়ায় অভাগিনী কারখানা হইতে বিতাড়িতা হইল। থেনেডিয়ারদের দেয় এই সময় হইতে বাকী পড়িতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া সে আপন মাথার চুল, সম্মুখের দাঁত পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া কন্যার খরচ জোগাইতে লাগিল। শেষে একেবারে অচল হইয়া পড়িল। থেনেডিয়ারেরাও এই সময় কসেটের অসুখের উল্লেখ করিয়া ১০০ ফ্রাঙ্ক চাহিয়া বসিল। নিরুপায় অভাগিনী তখন জীবনের শেষ ঐশ্বর্য্য বিক্রয় করিয়া পতিতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিল। ইহাই আধুনিক সভ্য সমাজের ক্রীতদাসী ব্যবসায়।

নরকের পথে আসিয়া ফ্যানটাইন ম্যাডেলিনের উপর জাতক্রোধ হইল। অবশেষে একদিন সামান্য অপরাধে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সে থানায় আনীতা হইল। ফ্রান্সের আইনে পুলিশই বারনারীদের বিচার করে। জাভার্ট তাহার ছয়মাস কারাবাসের আদেশ দিল। ম্যাডেলিন নিঃশব্দে সে কক্ষে আসিয়া এতক্ষণ ফ্যানটাইনের কথা শুনিতেছিলেন। জাভার্টের হুকুম রদ করিয়া তাহাকে মুক্তি দিয়া কারখানাবাটীর হাঁসপাতালে তাহাকে লইয়া আসিলেন। ক্রুদ্ধ জাভার্ট ম্যাডেলিনকে একজন দাগী আসামী—জীন ভ্যালজিন—বলিয়া সনাক্ত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের কাছে পত্র দিল। উত্তরে তাঁহারা জানাইলেন যে জাভার্টের সন্দেহ অমূলক, কারণ আসল জীন ভ্যালজিন কয়দিন হইল ধরা পড়িয়াছে। জাভার্ট আসিয়া ম্যাডেলিনকে সে কথা জানাইয়া, আপনাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য অনুরোধ করিল। ম্যাডেলিন অতিকষ্টে মানসিক তীব্র চাঞ্চল্য দমন করিয়া, তাহাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া বিদায় দিলেন।

জাভার্ট চলিয়া গেলে, তাঁহার মনের মধ্যে এক তুমুল আলোড়ন উঠিল। পরদিন অ্যারাসের সেসনে বিচার, জাভার্টের কাছে তিনি শুনিয়াছিলেন। সেদিন হাঁসপাতালে গিয়া ফ্যানটাইনের কাছে তিনি অনেকক্ষণ রহিলেন। সে রাত্রির ঘটনার পর হইতেই ফ্যানটাইনের প্রবল জ্বর ও কাশি; অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। থেনেডিয়ারদের প্রাপ্য সমুদয় অর্থ পাঠাইয়া দিয়া কসেটকে আনিবার জন্য ম্যাডেলিন ইতিমধ্যে পত্র দিয়াছেন,—কিন্তু নানা ওজর আপত্তি দেখাইয়া আরও আদায়ের আশায় তাকে তাহারা এ পর্য্যন্ত পাঠায় নাই। ম্যাডেলিন চিন্তিত হইতেছিলেন। ইতিমধ্যে জাভার্ট সে দুঃসংবাদ আনিয়া দিল।

এ কি অদৃষ্টের পরিহাস! সৎ না অসৎ, স্বার্থ না পরার্থ, আত্মরক্ষণ না আত্মবিসর্জ্জন—কোন পথ অবলম্বনীয়? অর্গলাবদ্ধ শয়নকক্ষে নিদ্রাহীন চক্ষে সমস্ত রাত্রি মিরিয়েল সেই কথাই ভাবিতে লাগিলেন। উত্তপ্ত মস্তিষ্কে আর সে চিন্তাভার সহ্য হইতেছিল না।

ম্যাডেলিনই যে জীন ভ্যালজিন, সে কথা বোধ হয় পাঠক পাঠিকা এতক্ষণে বুঝিয়াছেন। মিরিয়েলের আশীর্ব্বচন সফল হইয়াছিল। কিন্তু এ কি অদৃষ্টের ভ্রুকুটি! জীবনে এ কি পরীক্ষা আজ তাহার সম্মুখে উপস্থিত!]

দ্বিতীয় স্তর

(১০)

ম্যাডেলিন ত্রস্তে বাতিটা জ্বালিয়া ফেলিলেন। সে আলোকে যেন তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল।

"বাঃ ভয় কি? কি হয়েছে তাতে? এ ত আমারই মুক্তি। বিপদের যে ক্ষীণ চিহ্ন ছিল তাও ত আজ মুছে গেল। জাভার্ট—ডালকুত্তা জাভার্ট—আঃ, আর তার শ্যেন-দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করবে না। সম্ভবতঃ সে এর পর এখান থেকে চলে যেতেও চাবে। বাস্ তা হলেই ত আমি নিশ্চিন্ত। এ ত ভগবানেরই লীলা-খেলা, নইলে তিনি এমন

অঘটন ঘটাবেন কেন? এতেই বোধ হচ্ছে যে তিনি চান যে, আমি যে কাজে হাত দিয়েছি, নিশ্চিন্তভাবে তা শেষ করে যাই; যে আমি দশের উপকার করি, আমায় দেখে দশজন লোক নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে শিখুক; ভাল হোক্। কি ছেলেমানুষি সব এতক্ষণ ভাবছিলাম! ধর্ম্মযাজকের কাছে যেতে তখন অত ভয়ই বা পাচ্ছিলাম কেন? তাঁর কাছে আত্মকাহিনী জানালে তিনিও আমাকে নিশ্চয় এই কথাই বল্‌তেন। থাক্, —আর এর আলোচনাতেই কাজ নেই। ভগবান যা করেন, ভাল বুঝেই করেন।"

ম্যাডেলিন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনের অস্থিরভাব ত কই গেল না। সে সঙ্কল্পে চিত্তে ত কই শান্তি আসিল না?

এইখানে একটা কথা বলিতে চাই। মানুষ আপনার সহিত আপনি কথাবার্ত্তা কয়—এটা তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ। সে 'আপন'কে অন্তরাত্মা বল, বিবেক বল,—একই কথা। চিন্তা হইতে বিবেকে, এবং বিবেক হইতে চিন্তায়, বাক্য অনবরতই যাতায়াত করিতেছে,—বাক্যের চরম সার্থকতা তাহাতেই। মন যখন ভয়ঙ্কর অস্থির থাকে, তখন বাহিরে তাহার প্রকাশ না হইলেও, অন্তরের মধ্যে নীরবে শতমুখে সে আপনাকে ব্যক্ত করে। আত্মার স্বরূপ আমরা চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু তাহাতেই যে তাহা অলীক তাহার প্রমাণ হয় কি?

ম্যাডেলিন আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। মনে মনে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল যে, সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে দেওয়া হইতে পারে না; 'ভগবানের কার্য্যে হাত না দেওয়া' কথাটার কোন মূল্য নাই; অদৃষ্টের এ পরিহাস মানিয়া লইয়া একজন নিরীহ ব্যক্তির সর্ব্বনাশ সাধন করা অপেক্ষা নীচ ঘৃণিত ভণ্ডামির কাজ আর কিছুই নাই।

গত আট বৎসরের মধ্যে আজ ম্যাডেলিন সর্ব্বপ্রথম অন্যায় চিন্তা মনে স্থান দিয়াছিলেন, —ঘৃণায় পদাঘাতে তাহাকে দূর করিয়া দিলেন।

তিনি পুনরায় ভাবিতে বসিলেন। তাঁহার এ নব-জীবনের উদ্দেশ্য? কি তাহা? *শুধু আত্মগোপন, পুলিশের চক্ষে ধূলা দেওয়া?* ইহারই জন্য কি তাঁহার এত সব সাধু চেষ্টা? আর কোন উচ্চ লক্ষ্য নাই? দেহের রক্ষা নয়, আত্মার উদ্ধার; সাধু, উন্নত, পবিত্র, ন্যায়নিষ্ঠ ভাবে জীবন-যাপন;—বৃদ্ধ বিশপ কি তাহাই চান নাই? অতীতকে অন্তরালে রাখা? কিন্তু এ ত অন্তরাল করা নয়, এ যে নূতন পাপের সৃষ্টি করিয়া চক্ষের সম্মুখে তাহাকে প্রকাশিত করা। নূতন পাপ? নিশ্চয়ই! একজন নিরীহ লোকের জীবন, সুখ-শান্তি, সমাজ-আশ্রয় সব চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া—সে যে ডাকাতি, নরহত্যা! তার দেহের হত্যা, আত্মার অধঃপাতন! তাহা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর পাপ আর কি আছে? কিন্তু,—কিন্তু যদি সে নিজে যাইয়া তাহার স্থানে দাঁড়ায়, তাহাকে উদ্ধার করে, কঠোর কর্ত্তব্য ভাবিয়া পুনরায় জীন ভ্যালজিনরূপে গ্যালির শৃঙ্খল আপনার গলে তুলিয়া লয়; —সেই বুঝি তাহার যথার্থ নব-জীবন; তাহা হইলে বুঝি, যে নরক হইতে সে একদিন

বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে সে নরকের দ্বার চিরদিনের মত রুদ্ধ হইয়া যায়। আপাতঃ যন্ত্রণায় অন্তরালে বুঝি সকল যন্ত্রণার নিবৃত্তি তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহাই তাহার এখন একমাত্র কর্ত্তব্য। তাহার সাধন তাহাকে করিতেই হইবে। না করিলে, তার এত দিনের সাধু চেষ্টা সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে; এ সাধু জীবন, দুঃখ অনুতাপ সব নিরর্থক হইবে। ম্যাডেলিন চক্ষের সম্মুখে যেন বিশপের মূর্ত্তিখানি দেখিতে পাইলেন; তাঁর স্থির দৃষ্টি যেন তাঁহার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখিতেছিল; সে দৃষ্টির সম্মুখে, তিনি কি জীবনে এমন একটা পাপের বোঝা লইয়া চলিতে পারেন? জনসাধারণ তাঁহার মুখোস মাত্র দেখিতে পারে, কিন্তু তাঁর কাছে তার মুখের কলঙ্ক-কালিমা ত গোপন থাকিবে না। অপরে তাঁর কার্য্য দেখিয়া তাঁহার বিচার করিতে পারে, কিন্তু বিশপের পরিচয় যে তাঁহার বিবেকের সহিত। কিন্তু কি ভীষণ সে আত্ম-বলি, কি জ্বালা সে আত্মজয়ে, কি শোকাবহ সে অদৃষ্ট! তত্রাচ উপায়ান্তর যে নাই! মানুষের চক্ষে কলঙ্কিত হইয়াই ভগবানের চক্ষে তাঁহাকে পবিত্র হইতে হইবে। নান্যস্তস্য দ্বিতীয়ঃ পন্থা। "ভাল, তবে তাই হোক।"—বলিয়া, ম্যাডেলিন তাঁহার খাতাপত্র সব বাহির করিয়া মিলাইয়া দেখিয়া ঠিক করিয়া রাখিলেন; ছোট-খাট দোকানদারের কাছে প্রাপ্য দেনার হাতচিঠার তাড়াটা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন; লাফিট ব্যাঙ্কের নামে একখানা চিঠি লিখিয়া, গালামোহর করিলেন। তারপর দেরাজ হইতে পকেট বহিখানা বাহির করিয়া, নোট কয়খানা এবং কিছুদিন পূর্ব্বে সভ্যনির্ব্বাচনের সময় গৃহীত ছাড়-পত্রখানা একবার দেখিয়া লইলেন। তার পর চিঠিটা এবং পকেট-বহিখানা জেবের মধ্যে রাখিয়া পুনরায় পাদচারণা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মনে আত্মত্যাগের সংকল্পই বলবান। তবুও তাঁর গভীরতম অন্তরে জীবনের সেই প্রধান দুইটি লক্ষ্য—আত্ম-গোপন এবং সাধুভাবে জীবন যাপন—তাহাদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ তাহারা যেন দুইটি বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পরস্পর যুঝিতে আরম্ভ করিয়া দিল। একে সৎ, অপরে অসৎ-ছায়াশঙ্কী; একে আত্মোৎসর্গ, অপরে হীন স্বার্থ; একে বলে "ভাইকে", অপরে বলে—"আমাকে"; একের উদ্ভব আলোক হইতে, অপরের জন্ম তমসায়। কি তুমুল সে সংগ্রাম! দুইজনেই সমান বলশালী—কেহ কাহাকে হটাইতে পারে না। দেখিতে দেখিতে উভয়ের মূর্ত্তি পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া আকাশ জুড়িয়া দাঁড়াইল। ম্যাডেলিনের বোধ হইতে লাগিল যে, জীবনের অসীমত্বের মাঝে, গভীর তমসা-ঘোরে, যেন এক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সহিত এক বিকট দানবের সংগ্রাম বাধিয়াছে। দারুণ ভীতিতে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কিন্তু বিজয়-লক্ষ্মী দেবীরই পক্ষাবলম্বন করিতেছিলেন, অসুর ক্রমশঃই হীনবল হইয়া পড়িতেছিল।

ম্যাডেলিন বুঝিলেন,—আজই তাঁহার জীবনে যথার্থ অনন্ত মুহূর্ত্ত উপস্থিত। বিশপ সেদিন তাঁহার নবজীবন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনা করিয়া দিয়াছিলেন মাত্র; সাঁপম্যাথিউই

যথার্থ সে ভিত্তির উপর দেবালয় স্থাপন করিবার জন্ত আসিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় শত সহস্র চিন্তা আসিয়া তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল,—পুনরায় সে চিত্ত সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল,—কিন্তু আর তাঁহার সে সঙ্কল্প টলিল না। ম্যাডেলিন আপনমনে বলিতে লাগিলেন—"ধর না হয় সে চুরিই করেছে, তার শাস্তি—বড় জোর কারাগার। তাতে, আর আজীবন-গ্যালী-বাসে, অনেকটা তফাৎ। তার ওপর, চুরি যে সে করেছেই তার প্রমাণ কি? জীন ভ্যালজিনের নামটাই যে এ ক্ষেত্রে তার অপরাধের একমাত্র প্রমাণ হয় নি তা কে বলবে? সে যে দাগী আসামী—কাজেই সে নিশ্চয়ই চোর। অনেকেই এইভাবে বিচার করে থাকে।" তার পর একবার তাঁহার মনে হইল—"আচ্ছা, যদি আমি ধরাই দিই, তা হলে আমার এই আত্মত্যাগ, গত সাতবৎসরের এই সৎ জীবন, দেশের জন্য আমি এতদিন যা করেছি—এ সব ভেবে, কি তারা আমাকে ছেড়ে দেবে না?" বৃথা আশা। ম্যাডেলিন ভাবিয়া দেখিলেন—তাহা নিতান্তই অসম্ভব। ছোকরা জারভিসের সে ঘটনা যদি তাঁহার সহিত জড়িত না থাকিত, তাহা হইলে না হয় পৃথক কথা ছিল; কিন্তু সে দ্বিতীয় অপরাধ, আইনের চক্ষে অমার্জ্জনীয়—তাহার শাস্তি যাবজ্জীবন গ্যালীতে নির্ব্বাসন।

তবে কেন সে ভ্রান্ত কল্পনা, সে আশা-মরীচিকার সৃষ্টি?—সকল কুহেলিকা ছিন্ন করিয়া দিয়া, ম্যাডেলিন কর্ত্তব্য-সাধনের জন্য চিত্তকে দৃঢ় করিয়া লইলেন। গ্যালির নির্য্যাতন যতই কঠোর হউক,—তবু তাহাতে বুঝি দেবতার স্নিগ্ধ আশীষধারা থাকিবে! বাহিরে কৃত্রিম পুণ্য-লেখা, অন্তরে নরকাগ্নি-শিখা; অন্তরে যথার্থ পুণ্যের চির-বিমল জ্যোতিঃ, বাহিরে কলঙ্কের কালিমা-লেপ—কোন্‌টা জীবনে অধিক আকাঙ্ক্ষনীয়?

ম্যাডেলিন আর ভাবিতে পারিতেছিলেন না, তাঁহার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক আর সে দারুণ চিন্তা-ভার সহ্য করিতে পারিতেছিল না। বন্যার ন্যায় রক্তস্রোত প্রবলবেগে ললাটের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছিল, দ্রুতপাদচারণেও তাহার নিবৃত্তি হইতেছিল না। বিষয়ান্তরে তিনি মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অদূরে গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ১২টা বাজিয়া গেল।—কিছু দিন পূর্ব্বে কোন দোকানে একটা পুরাতন বিক্রেয় ঘণ্টা দেখিয়াছিলেন, তারই কথা ম্যাডেলিনের মনে হইল; তার উপরে "রোমেনভিলি নিবাসী অ্যান্‌টইন অ্যালবিয়ন" যে লেখা ছিল, সে কথাও তাঁহার মনে পড়িল।

বড় শীত। ম্যাডেলিন অগ্নিকুণ্ড জ্বালিলেন। জানালা বন্ধ করার কথা মনেই হইল না।

পুনরায় তিনি ভাবিতে বসিলেন। তাঁহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অতি কষ্টে পুনরায় তিনি সে সূত্র সংগ্রহ করিলেন।—"হাঁ, ঠিক। নিজের যথার্থ পরিচয় দেবো, এই সঙ্কল্পই ত করেছিলাম।"

কিন্তু,—ফ্যানটাইন? অকস্মাৎ সে অভাগিনীর কথা তাঁহার মনে পড়িল।

এ কি নূতন সমস্যা! তাহার ভার তিনি কাহার উপর দিয়া যাইবেন?

"তাই ত, আমি এতক্ষণ শুধু নিজের দিক দিয়েই দেখ্‌ছিলাম। নিজের স্বার্থ, নিজেরই সুবিধা খুঁজছিলাম। কিন্তু সেইটাই ত সব নয়। পরকে দেখা-ই সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম। ধর, আমি ধরা দিলাম, দিয়ে চিরদিনের মত গ্যালীতে রইলাম;—তার ফলে কি দাঁড়াবে? এই যে চারিদিকে এত কারখানা, এত কর্ম্মের চেতনা, শত শত পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-শান্তি, এই আত্মনির্ভরতা, দারিদ্র্যহীনতা, এই উদ্যমশীল শত শত কারিকর, এই অপূর্ব্ব নগরী—এ ত সবই আমার সৃষ্টি,—আমি গেলে এরা সব কোথায় থাক্‌বে? জীবনীশক্তি গেলে দেহ কতক্ষণ থাকে? আর এই স্ত্রীলোক,—যার এত দুঃখদুর্দ্দশার মূল একমাত্র আমি, যে আজ মৃত্যুশয্যায় পড়ে আমারই করুণার উপর নির্ভর করে আছে, কন্যাকে এনে দেবো বলে যাকে আশ্বাস দিয়ে রেখেছি, আমি গেলে সে-ও ত মর্‌বে। তারপর তার অনাথা কন্যার কি দশা হবে? ভাল, যদি আমি চুপ করে থাকি, আত্ম-প্রচার না করি,—তা হলে কি হয়?" ম্যাডেলিন কয়েকমুহূর্ত্ত আপনমনে কি ভাবিলেন:—"লোকটা তা হলে গ্যালীতে যায়। কিন্তু সে চুরি করে কেন? যা-ই ভাবি, চুরি সে করেছে, নিশ্চয়ই করেছে। যাক্ না কেন তবে সে গ্যালিতে? আমার তাতে কি? ধর, যদি আমি এইভাবেই থাকি তা হলে আরও দশ বছরে আমি এককোটি ফ্রাঙ্ক উপার্জ্জন কর্‌ব। ধর তার সমস্তই আমি দেশের জন্য বিলিয়ে দিলাম। নিজের জন্য কিছুই রাখ্‌লাম না। তাতে দেশে সম্পদ বাড়্‌তে লাগ্‌ল; বাণিজ্য কারবারে নিত্য নূতন চেতনা আস্‌তে লাগল; চারিদিকে নূতন নূতন কারখানার সৃষ্টি হতে লাগ্‌ল; শত শত পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-শান্তি এল; দেশ ধনে ধান্যে জনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল; যেখানে এখন শুধু মাঠ আর গোলাবাড়ী, সেখানে দেখতে দেখতে নূতন নূতন পল্লী বস্‌তে লাগ্‌ল দারিদ্র্য আর তার সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যের সহচর অধর্ম্মনীতি হেয়বৃত্তি সব একে একে দূর হয়ে যেতে লাগ্‌ল।—এই অভাগিনী মা এ রোগ শয্যা ছেড়ে, মেয়েকে বুকে ধরে আশায় আনন্দে কর্ম্মক্ষেত্রে নাম্‌ল!—তাই ত, কি ভাব্‌ছিলাম এতক্ষণ আমি? এ সবই নষ্ট করতে হবে? যে-হেতু একটা খুব উঁচুমনের কাজ করে, একটা চটক দেখিয়ে আত্মপ্রসাদ নিতে হবে বলে? বেশ melo-dramatic বটে! কিন্তু তা বলে একটা সমগ্র সহরের শত শত লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌ব? একজন হতভাগিনীর হত্যার কারণ হব? একটা মেয়েকে নিরাশ্রয় করে মর্‌বার জন্য পথে ছেড়ে দেবো? কার জন্য? না, একটা চোর, জোচ্চোর, বাটপাড়, বদমাইস, যে আজ বাদে কাল এমনই মর্‌বে,—তার জন্য? হতভাগার চাল নেই চুলো নেই,—না খেতে পেয়েই ত আজ বাদে কাল সে এমনিই মর্‌বে,—গ্যালীতে গেলে বরং দুটো খেতে পেয়ে বাঁচবে। তার জন্য হাজার হাজার লোক মর্‌বে কেন? কসেট,—আমি ছাড়া আজ আর তাকে দেখবার কে আছে? পিশাচ থেনেডিয়ারদের ঘরে এই দারুণ শীতে, আহা, বুঝি সে নীলবর্ণ হয়ে পড়ে আছে! না, আমি মন স্থির কর্‌লাম। এতে যদি পাপ হয় হোক্,—সে পাপ আমারই হবে,—আমার সে পাপের জন্য শত শত

লোকের যদি পুণ্য হয়, তবে সেই পাপই আমার শ্রেয়।”—ম্যাডেলিন পুনরায় পাদ-চারণা আরম্ভ করিলেন। এতক্ষণে তাঁহার চিত্তের ভার, অনেকটা লঘু হইয়া আসিয়াছিল।

পৃথিবীর অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহা হইতেই হীরক-খণ্ড মেলে, গভীরতম চিন্তা হইতেই সত্যের উদ্ভব হয়। এতক্ষণের জটিল চিন্তাজালের ঘনতমসার মধ্য হইতে বুঝি ম্যাডেলিন, সহসা কোন্ এক সত্যের—এক হীরকখণ্ডের—আবিষ্কার করিয়াছিলেন,—তাহার আলোকে তাঁহার চক্ষু ঝলসাইয়া যাইতেছিল।—“নিশ্চয়ই। আর ভাবনা চিন্তা নেই। আর সকলের মঙ্গলের জন্য আমাকে ম্যাডেলিনই থাক্‌তে হবে। বাহিরে অন্ধকারের মধ্যে জীন ভ্যালজিনের সে ভয়ঙ্কর নামটা ঘুরে বেড়াচ্ছে; সাবধান, যদি কখনো কারও মাথার উপর সে এসে দাঁড়ায় তবে সে হত-ভাগ্যের আর নিষ্কৃতি নেই!”

তারপর সহসা বলিলেন——“তাই ত, এখনও জীন ভ্যালজিনের সঙ্গে আমার যে কয়টা পরিচয়-সূত্র আছে,—সে সব ছিঁড়ে ফেল্‌তে হবে। তার সাক্ষী আর কিছু রাখা হবে না।” বলিয়া মুদ্রাথলি বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র চাবি লইয়া কক্ষগাত্রে অলক্ষ্যপ্রায় এক গুপ্ত আলমারি খুলিলেন। তাহার মধ্যে শুধু কতকগুলা পুরাতন জিনিস;—একটা পুরাতন প্যাণ্ট, একটা জীর্ণ কোট, একটা থলি, একটা লৌহ-বিদ্ধ যষ্ঠি—ছিল। অতীতের কথা সব সময় স্মরণ করাইয়া দিবে বলিয়া, ম্যাডেলিন সেগুলা রাখিয়া দিয়াছিলেন। তবে. গ্যারীর জিনিস—তাই গুপ্ত রক্ষিত ছিল; বিশপ-প্রদত্ত সে বাতিদান দুইটা তাঁহার মেজের উপরেই প্রকাশ্যভাবে থাকিত।

ম্যাডেলিন সন্দিগ্ধভাবে একবার দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; সুদৃঢ় অর্গলেও বুঝি ভরসা নাই!—তার পর, চকিতে দুই হাতে করিয়া সেগুলা সমস্ত একেবারে তুলিয়া লইয়া অগ্নিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। দেখিতে দেখিতে অতীতের সে সব চিহ্ন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; ম্যাডেলিন সে গুপ্ত কক্ষ বন্ধ করিয়া, একটা ভারি আলমারি টানিয়া আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিলেন।

সহসা কক্ষমধ্যে সেই বাতিদান দুইটার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তাই ত, সে দুটাও থাকে কেন? তাহাদের গলাইবার মত তীব্র তাপ তখন সে অগ্নিকুণ্ডে ছিল। ম্যাডেলিন আগুন ঠেলিয়া দিলেন, পরক্ষণেই সে বাতিদান দুইটা অগ্নিমুখে নিক্ষিপ্ত হইত,—কিন্তু সহসা তাঁহার অন্তরের মধ্য হইতে কে যেন চীৎকার করিয়া উঠিল—“জীন ভ্যাল-জিন! জীন ভ্যালজিন!”

ম্যাডেলিনের সমস্ত দেহ দারুণ ভীতিতে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে স্বর বলিতে লাগিল—“হাঁ, সব শেষ করে দাও। বিশপকে ভুলে যাও, তাঁর শেষ স্মৃতি-চিহ্ন মুছে ফেল, স্যাঁপমাথিউর সর্ব্বনাশ কর। লোকের শ্রদ্ধা সম্মান পাও, দেশকে ধনী কর, আতুর দরিদ্রদের প্রতিপালন কর, অনাথার ভার নাও;—কিন্তু মনে থাকে যেন যে যতদিন তুমি বসে বসে সুখ-স্বপ্ন গড়বে, ততদিন আর একজন দুর্ভাগা তোমার কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে, জীবনের শেষ কয়টা দিন, অত্যাচার

নির্য্যাতন যন্ত্রণায় তিলে তিলে মর্‌বে। বাঃ বেশ ব্যবস্থা করেছ, জীন! তোমার জয় জয়কার হোক্। শোন জীন ভ্যালজিন, মানুষমাত্রেই অপরের মঙ্গল প্রার্থনা বা অভিশাপ পেয়ে থাকে; তোমার ক্ষেত্রে, ভগবানের কাছে, কেবল সে অভিশাপই গিয়ে পৌঁছাবে।” সে স্বর ক্রমশঃ গম্ভীর হইতেছিল; শেষ অংশ যেন স্পষ্ট নির্ঘোষে নিনাদিত হইয়া উঠিল। ম্যাডেলিন সভয়ে কক্ষের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। “কে আছ এখানে?” তার পর মূর্খের ন্যায় হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন—“কি বোকা আমি? কে আবার থাক্‌বে এখানে?”

কিন্তু একজন—যিনি চর্ম্মচক্ষের অতীত, ত্রিকালের নিত্যসাক্ষী—তিনি সেখানে ছিলেন।

ম্যাডেলিন বাতিদান দুইটা দেরাজের উপর রাখিয়া দিয়া পুনরায় পাদচারণা করিতে লাগিলেন। মনের দারুণ অস্থিরতার সময় যে কোন একটা দৈহিকগতিতে বুঝি অনেকটা উপকার হয়; স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য যাহা কিছু চক্ষে পড়ে, তাহাদের নিকট হইতে বুঝি পরামর্শ গ্রহণের সুবিধা হয়। তাঁহার সম্মুখে এখন দুইটিমাত্র পথ,—কিন্তু দুইটি পথই সমান ভয়াবহ! কি নির্ম্মম অদৃষ্টের ভ্রূকুটি!—কেন সে হতভাগা জীন ভ্যালজিন ভ্রমে ধরা পড়িল? যে সূত্র অবলম্বন করিয়া চির-জীবনের মত নির্য্যাতনের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন বলিয়া তিনি এই কতক্ষণ ভাবিতে-ছিলেন, সেই সূত্রই যে নাগপাশ হইয়া তাঁহার শ্বাসরোধ করিতে আসে!

ম্যাডেলিন ভবিষ্যতের কথা একবার ভাবিয়া দেখিলেন। স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করা? তার অর্থ—এই পবিত্র, উজ্জ্বল সাধু জীবন, এই সম্মান, স্বাধীনতা, দশের শ্রদ্ধাভক্তি—এ সকল হইতে জন্মের মত বঞ্চিত হওয়া। সে চিন্তাতেও তাঁর চিত্ত হাহাকার করিয়া উঠিল! উন্মুক্ত প্রান্তরের উদার সমীরণ, বসন্তের পাখীর কাকলি, আর সে প্রাণে সুখ-শিহরণ আনিবে না; অনাথ শিশুদের মধ্যে আহার্য্য বণ্টন করিয়া তাহাদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সরল মুখচ্ছবি আর দেখিতে পাইবেন না; এই যে তাঁর স্বনির্ম্মিত আবাসবাটী ইহার সহিত আর সম্বন্ধ থাকিবে না; ও পুস্তকগুলি আর পড়িতে, বা এ ক্ষুদ্র মেজের উপর আর লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতে পারিবেন না। জন্মের মত প্রিয়ধনগুলিকে বিদায় দিতে বসিয়া, প্রত্যেক জিনিসটিকে আকুল মায়ায় তিনি জড়াইয়া ধরিতেছিলেন।—মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়া তিনি যেন ‘প্রাণপণে জীবনের একান্ত সম্ভোগ’ করিতে চাহিতেছিলেন!—কিন্তু শুধু বিদায়ের ব্যথাতেই ত তার অবসান নয়। পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে সে যে কোন্ অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে নিমজ্জন। সেই লৌহশৃঙ্খল; সেই নির্য্যাতন; এই প্রৌঢ়বয়সে পুনরায় পদে পদে লাঞ্ছনা, অপমান; তাঁহার বর্ত্তমান পরিচয় লইয়া সেখানে সকলকার অবশ্যম্ভাবী পরিহাস; রাত্রে, শ্রান্ত ক্লান্ত সর্ব্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত অবস্থায় প্রতিহারীর চাবুকের তাড়নায়, পরিখাবেষ্টিত কারাকক্ষে অভিগমন। হায়, অদৃষ্ট কি মানুষের এতই ভাবিয়া চিন্তিয়া, মানবের মত দানব-চিত্ত লইয়া, নির্য্যাতন করিতে বসে?

পিশাচের চিত্ত লইয়া স্বর্গে অবস্থিতি

নরকে প্রত্যাগত হইয়া দেবত্বের অধিকারী হওয়া—কোন্ পথ অবলম্বনীয়? সে প্রশ্নের সমাধান হইল না; যন্ত্রণা, অস্থিরতা বাড়িয়াই চলিল। চিন্তা, ভাব, ক্রমশঃই সে মনে এক কিম্ভূত-কিমাকার বেশ ধারণ করিতে লাগিল। শরীর এবং মন—বাহির এবং অন্তর—উভয়ই তাঁহার টলিতেছিল। ম্যাডেলিন বুঝিলেন যে আত্মসমর্পণ করুন বা না করুন—এ দ্বন্দ্বে তাঁহার কিছু না কিছুর বিনাশ ঘটিবেই; যে, তাঁহার দক্ষিণে বামে উভয়দিকেই মহা-শ্মশান; যে, আজিকার এ মানসিক যন্ত্রণা মৃত্যু-যন্ত্রণারই নামান্তর,—সে মৃত্যু হয় তাঁহার সুখের, নয় তাঁহার পুণ্যের!

(১১)

ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া গেল। পূর্ণ পাঁচ ঘণ্টা কাল ম্যাডেলিনের সে পাদচালনার বিরাম ঘটে নাই। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া তিনি একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাকর্ষণ হইল। নিদ্রাবস্থায় তিনি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন—যেন তিনি এক প্রান্তরে দাঁড়াইয়া; প্রাণ উদাস করা দিগন্ত-বিস্তৃত সে প্রান্তর; তৃণ-লতা-বৃক্ষ কিছুই চক্ষে পড়ে না। রাত্রি কি দিন কিছুই বুঝা যায় না। শৈশবের সহচর এক ভ্রাতার সহিত তিনি যেন গল্প করিতেছিলেন; পথ দিয়া কত লোক যাতায়াত করিতেছিল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটা লোক পাংশুবর্ণ একটা ঘোটকের উপর চড়িয়া আসিতেছিল, তাহার হস্তে বক্রস্থূল যষ্টি, কেশহীন শিরোস্থিকঙ্কালের মধ্যে স্নায়ু-তন্তু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কোন কথা না বলিয়া, বরাবর সে চলিয়া গেল। ভ্রাতা বলিলেন—'চল, যেখানে লোকজনের যাতায়াত নেই, এমন পথে যাই।'—সে পথে কখনও বুঝি কেহ আসে নাই, তৃণগুল্ম কিছুই সেখানে নাই, মাটির ন্যায় সবই ধূসরবর্ণ, আকাশও তাই। কতক পথ অগ্রসর হইয়া, প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া সহসা আর ভ্রাতাকে তিনি দেখিতে পাইলেন না। বরাবর সেই পথ ধরিয়া অবশেষে এক পল্লীতে তিনি উপনীত হইলেন। প্রথম পথে জন-মানব ছিল না, দ্বিতীয় পথের পার্শ্বে একটা লোক দেয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।—"এটা কোন্ জায়গা? কোথায় এসেছি আমি?" লোকটা উত্তর করিল না। পার্শ্বে একটা বাটীর দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া তিনি তাহাতে প্রবেশ করিলেন; প্রথম কক্ষ নিৰ্জ্জন, দ্বিতীয় কক্ষে প্রাচীরগাত্রে ভর দিয়া একটা লোক দাঁড়াইয়া। "কার বাড়ী এটা? এটা কোন জায়গা?" সে-ও কোন উত্তর দিল না। বাটীর সংলগ্ন একটা উদ্যান ছিল;—দ্বিতীয় বৃক্ষের কাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া একটা লোক। "এ কার বাগান? কি জায়গা এটা?" লোকটা কথা কহিল না। সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি দেখিলেন—সে ত পল্লী নয়, সে একটা বৃহৎ সহর। পথ-ঘাট, কুটীর-প্রসাদ, উদ্যান, সবই রহিয়াছে, কিন্তু কই কেহ ত চলাফেরা করে না। কেবল, প্রতি পথের কোণে, প্রতি দ্বারের পার্শ্বে, প্রত্যেক জিনিষের অন্তরালে একটা করিয়া ভাষাহীন মানুষ। অথচ একটার বেশী একেবারে চোখে পড়ে না। তাহারা মূক কিন্তু মৃত নয়,—চলিবার সময়, তাঁর প্রতি কেবলি তাহারা চাহিতেছিল। নগর ছাড়িয়া পুনরায় তিনি প্রান্তরে আসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন,

এক বৃহৎ জনতা তাঁহারই অভিমুখে আসিতেছে। সহরের মধ্যে যাহাদিগকে কিছু পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তারা সেই সব লোক, সকলেরই মুখ পাংশুবর্ণ; ম্যাডেলিন তাহাদের চিনিলেন। তারা খুব দ্রুত আসিতেছিল, অথচ তাহাদের পদক্ষেপে চাঞ্চল্য বা শব্দমাত্র ছিল না। নিমেষের মধ্যে তাহারা আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সহরে প্রথম দৃষ্ট সেই ব্যক্তি মুখপাত্র হইয়া বলিল—"কোথায় যাচ্ছ? জান না কি যে অনেকদিন হ'ল তোমার মৃত্যু হয়েছে?" বিস্মিত হইয়া তিনি কি উত্তর দিতে যাইবেন এমন সময় সহসা সব শূন্যে মিলাইয়া গেল। চকিতে ম্যাডেলিনের নিদ্রাভঙ্গ হইল।—প্রবল হিম বায়ু উন্মুক্ত বাতায়নের ঝিলিমিলি-গুলাকে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপাইয়া দিতেছিল; অগ্নিকুণ্ড নির্ব্বাপিত, বাতিও নিঃশেষিতপ্রায়; বাহিরে অন্ধকার; তখনও রাত্রি অবসান হয় নাই। ম্যাডেলিন উঠিয়া বাতায়ন-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—আকাশে তারার চিহ্নমাত্র নাই; দূরে সদর রাস্তার উপর দুটা জিনিষ জ্বলিতেছিল। কি ও? আকাশভ্রষ্ট হইয়া বুঝি দুইটী তারা মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়াছে? চতুষ্পার্শ্বের ঘনান্ধকারের মধ্যে তাহারা যেন তাণ্ডব নৃত্য করিতেছিল।—সহসা একটা কর্কশ শব্দে তাঁহার মোহ কাটিয়া গেল।—না, তাই ত, এ ত তারা নয়; একটা সাদা ঘোড়ায় টানা ছোট একখানা গাড়ী—এ যে তারই আলো। গাড়ী? কার গাড়ী? এত ভোরে কে এ'ল?

বাহির হইতে দ্বারের উপর করাঘাত পড়িল।

ম্যাডেলিন শিহরিয়া উঠিলেন—"কে?"

"আজ্ঞে আমি, হাকিম সাহেব।"—সে কণ্ঠস্বর বৃদ্ধা পরিচারিকার।

"কি চাও?"

"আজ্ঞে, ঠিক পাঁচটা বেজেছে।"

"কি তাতে?"

"আজ্ঞে, গাড়ী হাজির।"

"গাড়ী? কিসের গাড়ী?"

"আজ্ঞে, গাড়ী যে আস্তে বলেছিলেন।"

"কই, না।"

"তবে কোচম্যান যে বল্‌ছিল—"

"কোচম্যান? কার কোচম্যান?"

"আজ্ঞে, স্কফ্লেয়ার সাহেবের—"

স্কফ্লেয়ার? ম্যাডেলিনের সমস্ত দেহ মুহূর্ত্তে কম্পিত হইয়া উঠিল। আপন মনে মৃদুস্বরে বলিলেন—"স্কফ্লেয়ার? হাঁ স্কফ্লেয়ারই ত বটে!"

কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে কাটিল। ম্যাডেলিন নির্ব্বোধের ন্যায় দীপশিখার প্রতি চাহিয়া গলিত বাতির কিয়দংশ ন'খে তুলিয়া লইয়া আনমনে গুলি পাকাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধা বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পর সে সুধাইল—"কি বল্‌ব গিয়ে তবে তাকে?"

"বল, যে আমি যাচ্ছি।"

(১৩)

আমরা যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন রেল হয় নাই,—অশ্বযানই তখন যাতায়াতের এবং ডাক বিলির প্রধান অবলম্বন ছিল।

শেষরাত্রিতে অ্যারাসের ডাকগাড়ী নক্ষত্র-বেগে ছুটিয়া আসিতেছিল; সহরে ঢুকিয়া মোড় ফিরিতেই দ্রুতগামী একখানা টমটমের

সহিত তাহার সজোরে ধাক্কা লাগিল। কিন্তু টমটম থামিল না, পূর্ণবেগে আপনার গন্তব্য বিপরীত দিকে ছুটিয়া চলিল। টমটমে একটি-মাত্র আরোহী—তিনি ম্যাডেলিন।—কোথায় তিনি চলিতেছিলেন? কেন এত দ্রুত চলিতে-ছিলেন?—সে প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় তিনি দিতে পারিতেন না।—কে যেন তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে ঠেলিতেছিল, কিসে যেন তাঁহাকে সম্মুখদিকে টানিতেছিল—এই পর্য্যন্ত। কেন, তাহা তিনি জানিতেন না। এমন কোন মানুষ নাই যে, জীবনে, একদিন না একদিনও, অজ্ঞাতের এ অন্ধকারময় গভীর গুহার মধ্যে আসিয়া পড়ে না। কোন বিষয়েই তাঁহার কৃতনিশ্চয়তা ছিল না। ঘটনাচক্রের ক্রীড়াপুত্তলির ন্যায় তিনি স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিতেছিলেন। তবে, আব-ছায়ার মত এক একবার তাঁহার মনে হইতেছিল—ঘটনা যে ভাবে ফিরুক স্বচক্ষে সমস্ত ব্যাপার একবার দেখা আবশ্যক। যদিই এ আনায় হইতে তিনি মুক্তি পান—তাহা হইলেও বিচারের সময় উপস্থিত থাকিয়া স্বচক্ষে সব দেখা তাঁহার পক্ষে যুক্তিযুক্তই বটে।—কি আশ্চর্য্য! ব্রেভেট, সেনিলড্যু, জাভার্ট—এরা সকলেই কি অন্ধ?—ভাল, অদৃষ্ট ত তাঁহার আপনার হাতেই।—নিজে আত্মপ্রকাশ না করিলে তাঁর কি ভয়? তত্রাচ পথের অনুপাতে তাঁহার উৎসাহও ক্রমে হ্রাস পাইতেছিল।

হেস্‌ডেন প্রথম চটি। সেখানে যখন পৌছাইলেন তখন রৌদ্র উঠিয়াছে। ঘোড়ার বিশ্রামের জন্ত তিনি রশ্মি সংযত করিলেন। কিন্তু সে টমটম আর চলে না। ডাকগাড়ীর সহিত ধাক্কা লাগিয়া টমটমের চাকা জখম হইয়া গিয়াছিল, ম্যাডেলিন তখন বুঝিতে পারেন নাই। কাছেই 'লোহাড়' ছিল,—সে কিন্তু পুরা একদিনের কমে চাকা সারাইতে পারিবে না, বলিল। সর্ব্বনাশ! তবে উপায়? আজ সন্ধ্যার সময়ই যে বিচার! ম্যাডেলিন তাহার সহিত অনেক তর্কবিতর্ক করিলেন, অবশেষে নূতন চাকা ক্রয় করিতেও চাহিলেন, —কিন্তু সব চাকা ত সব গাড়ীতে লাগে না! অবশেষে নূতন কোন যানের সন্ধান করিলেন। কিন্তু গাড়ীও সেখানে মেলে না। বহু অনু-সন্ধানেও কোন ফল হইল না। ম্যাডেলিনের মুখে সহসা একটা আনন্দ-লেখা ফুটিয়া উঠিল। যাক্, তবে ভগবানের ইচ্ছা নয় যে, তিনি আত্মপ্রকাশ করেন? যে বজ্রমুষ্টি জাভার্টের সহিত প্রথম কথাবার্ত্তার সময় হইতে তাঁহাকে দৃঢ়বন্ধে চাপিয়াছিল এতক্ষণে তাহা শ্লথ হইয়া গেল। একটা চরম আশ্বস্তি অনুভব করিয়া তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

কিন্তু, অদৃষ্টের নাগপাশ মুক্ত হইয়াও ত মুক্ত হয় না! কিয়ৎক্ষণ পরে কোথা হইতে এক বৃদ্ধা আসিয়া বলিল—"আপনি গাড়ীর খোঁজ করছিলেন? আমার গাড়ী আছে।"

ম্যাডেলিন শিহরিয়া উঠিলেন।—'লোহাড়' কিন্তু নিকটেই ছিল, বাধা দিয়া সে বলিল—"সে আবার গাড়ী? না আছে কাঠ, না আছে স্প্রীং, না আছে ছই—সে গাড়ীতে ভদ্রলোক যেতে পারে না।" কিন্তু ম্যাডেলিন তাহাদের সহিত একমত হইতে পারিলেন না।—দু'খানা চাকা ত তার আছে? যেমন করিয়াই হোক্, তাতেই অ্যারাসে পৌছান যাবে। টমটমটা

সারাইতে দিয়া, বৃদ্ধার গাড়ীখানা লইয়া ম্যাডেলিন পুনরায় অগ্রসর হইলেন।—কয়েকমুহূর্ত্ত পূর্ব্বের সে ক্ষণিক উল্লাসের কথা ভাবিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ বিরক্তই হইলেন। স্বেচ্ছায়ই ত তিনি চলিয়াছেন, তবে সে গতিভঙ্গ জন্য এত আশ্বস্তি কেন?—একটা ছোকরা ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছিল। "মশাই, আমিই বুড়ীকে সন্ধান দিয়ে গাড়ী এনে দিয়েছি। আমার বকসিস্?"

সদা-মুক্তহস্ত ম্যাডেলিন আজ সহসা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।—বকসিস কিসের? এ ত জুলুম মন্দ নয়?—"যা যা, সবে যা। আবার বকসিস্ নিতে এসেছে।" ম্যাডেলিন সশব্দে অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন।

পরের চটি সেণ্টপল। পথিপার্শ্বেই সরাই। প্রাতরাশে বসিয়া এক টুকরা রুটি মুখে দিয়াই ম্যাডেলিন উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন—"রুটী এত তিত কেন?"

অ্যারাস তখনও অনেকটা পথ। কত বৃক্ষলতা, পর্ণকুটীর, হরিৎশস্যক্ষেত্র, দিগন্তের কোলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত নব নব দৃশ্য তাঁহার চক্ষে পড়িতেছিল। সমস্ত জীবন ভরিয়া দিয়া, ক্ষণকালের জন্য যেন সকল ভাবনা চিন্তা হইতে মানুষকে তারা ভুলাইয়া রাখে।—এই যে শত সহস্র দৃশ্য আজ সর্ব্বপ্রথম চক্ষে পড়িতেছে, জীবনে আর ইহাদের সহিত বুঝি সাক্ষাৎ ঘটিবে না,—কি গভীর দুঃখময় সে অনুভূতি, কে তাহার পরিমাণ করিবে। ক্ষণে জন্ম, ক্ষণে মৃত্যু, এই না বিদেশ-ভ্রমণ? মানব-জীবনের সহিত তাহার কি নিবিড়তম সাদৃশ্য!—এই ক্ষণপরিবর্ত্তনশীল দিগন্তের দৃশ্যাবলীর ন্যায় মানব-জীবনের ঘটনাবলীও সদা পরিবর্ত্তনশীল। এই অন্ধকার, এই আলো; এই পূর্ণিমার রজতধারা, এই রাহুর করালগ্রাস। আমরা চাহিয়া চাহিয়া দেখি, দ্রুত চলিয়া চলি, হাত বাড়াইয়া যাহা পাই ধরিতে যাই; প্রত্যেক ঘটনা যেন রাস্তার এক একটা ফের,—প্রতি পাদক্ষেপেই আমরা বার্দ্ধক্যের পথে অগ্রসর হই। একটা ক্ষণিক স্পন্দন, তার পরই চারিদিক অন্ধকার! তারপর কোন এক অশরীরী মূর্ত্তি আসিয়া, জীবনরূপ যে অশ্ব এতদিন আমাদের বহিয়া আনিতেছিল, তাহাকে সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে একা দূর করিয়া দেয়!

টিনকুয়েতে আসিয়া অশ্ব ক্লান্ত হইয়া পড়িল, ম্যাডেলিন একটা সহিস ও আর একটা ঘোটক লইলেন।—তখন গোধূলির আরক্তরাগে পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে।

তখনও অনেকটা পথ। পথঘাটের অবস্থাও ভাল নয়,—রাস্তা মেরামতের জন্য পথের মধ্যে মধ্যে স্তূপীকৃত প্রস্তর খণ্ডসমূহ রাখিয়া দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আসিয়া পড়িল।—সূচীভেদ্য অন্ধকার—এক হস্ত ব্যবধানে দৃষ্টি চলে না,—প্রস্তরস্তূপে মধ্যে মধ্যে শকটের গতি প্রতিহত হইতেছিল। সহসা 'বোম'টা ভাঙ্গিয়া গেল।—কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অবশেষে ম্যাডেলিন একটা গাছের ডাল কাটিয়া লইয়া রসি দিয়া বাঁধিয়া কোনরূপে তাহাকে কার্য্যোপযুক্ত করিয়া লইলেন। সহিসকে বলিলেন—"ডবল ভাড়া পাবে—যত জোরে পার হাঁকাও।"

(১৩)

অ্যারাসের সেসন-আদালত-গৃহের সম্মুখে

আসিয়া যখন তিনি পৌঁছাইলেন, তখন রাত্রি ৮টা। আদালতের বাহিরে উকীল-মোক্তারের খুব ভিড়।—তবে কি বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে?

সাহসে ভর করিয়া ম্যাডেলিন জনৈক উকীলকে বলিলেন—"মোকদ্দমাটা কেমন বুঝছেন?"

"সে ত শেষ হয়ে গেছে।"

"শেষ হয়ে গেছে!"

উকীলটি সে তীব্র কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া ফিরিয়া বলিলেন—"আপনি কি তার কোন আত্মীয়?"

"আজ্ঞে, না, তা নয়।—কি রায় হ'ল? —দণ্ড—"

"নিশ্চয়। দণ্ড হবে না?"

"সপরিশ্রম মেয়াদ?"

"হাঁ, যাবজ্জীবনের জন্ম।"

ম্যাডেলিনের কণ্ঠদেশ যেন কে চাপিয়া ধরিয়াছিল। ক্ষীণস্বরে তিনি বলিলেন—"পরিচয় তা হলে প্রমাণ হয়ে গেছে?"

"পরিচয়ের আবার প্রমাণ কি? এ ত সোজা কথা। স্ত্রীলোকটা যে তার ছেলেকে মেরেছে তা ত সে স্বীকারই করছে। তবে ঝোঁকের মুখে কাজটা হয়ে গেছে,—তাই চরম দণ্ড হ'ল না।"

"স্ত্রীলোকটা?—"

"তবে কি? সেই লিমোসিন মেয়েটা। আপনি কার কথা জিজ্ঞাসা করছেন?"

"না,—হাঁ,—আচ্ছা, তবে এখনও হলেতে এত আলো কেন?"

"ওঃ! এখন সেই দাগী কয়েদী—তার নাম মনে পড়ছে না,—সেই গ্যালির পুরাণো পাপীটার বিচার হচ্ছে। তা সেও প্রায় ঘণ্টা দুই হ'ল আরম্ভ হয়েছে।"

"ওখানে আমি যেতে পারি?"

"বোধ হয় ত নয়। তবে ভিড় এইবার কম্‌বে—একবার চেষ্টা করতে পারেন। ঐ বড় ফটকটা দেখছেন, ঐটা যাবার পথ।" বলিয়া উকীলটী প্রস্থান করিলেন।

ম্যাডেলিন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এই কয়েক মুহূর্ত্তে কি না যাতনা, কি না তীব্রতম অনুভূতি তাঁহার জীবনকে মন্থনদণ্ড করিয়া তাণ্ডব-নৃত্য করিয়াছে!

স্থানে স্থানে জটলা বাধিয়াছিল। সকলেরই মুখে এক কথা—"লোকটার আর পরিত্রাণ নেই। এ সরকারী উকীলের হাত হ'তে কেউ কখনো উদ্ধার পায়নি। এ ত গ্যালির কয়েদি।" ইত্যাদি। ম্যাডেলিন দু'এক স্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে তর্ক-বিতর্ক শুনিলেন। অবশেষে, হলের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রহরীকে বলিলেন—"আমি যেতে চাই। দরজা এখনি খুল্‌বে কি?" "দরজা আর খুল্‌বে না। ভিতরে জায়গা নেই।" "জায়গা নেই?" "দু'একখানা চেয়ার আছে বটে, জজসাহেবের পিছন দিকে। কিন্তু সরকারী বড় কর্ম্মচারী নইলে সেখানে কেউ যেতে পারবে না।"

নতমুখে ধীরে ধীরে ম্যাডেলিন সে স্থান ত্যাগ করিয়া আসিলেন। তাঁহার অন্তরে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল। আনমনে সোপানশ্রেণীর কিয়দংশ অতিক্রম করিয়া আসিয়া সহসা তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; তার পর জেব হইতে কাগজ পেন্সিল বাহির করিয়া নোট-বহির একখানা পাতা ছিঁড়িয়া

তাড়াতাড়ি আপনার নাম এবং পদবী লিখিয়া, ক্ষিপ্রপদে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া প্রহরীর হাতে কাগজের টুকরাখানা দিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"জজ সাহেবকে দাও গে যাও।"

প্রহরী একবার মাত্র অক্ষরগুলার উপর দৃষ্টিপাত করিল, তারপর তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

(ক্রমশ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

নব বর্ষে

(রাহু-কেতুর প্রতি)

আস্‌ছে আসুক নূতন বছর তোদের কিবা তায়,
কাটা মুণ্ডে দগ্ধ তুণ্ডে কেম্‌নে হাসি পায় ?
কোন্ বা আশায় কোন্ ভরসায় মনেতে সুখ জাগে,
ছিন্ন কায়া শবের ছায়া কোন্ বা কাজে লাগে!
আকাশ ভরা গ্রহ তারা ছুট্‌ছে হাস্য মুখে,
নবোদ্যমে পরাক্রমে আগুন জ্বলে বুকে!
ধ্রুব লক্ষ্যে কর্ম্ম কক্ষে চল্‌ছে দিবারাতি,
চির শ্রমণ বিশ্ব ভ্রমণ কি জ্যোতিষ্ক জাতি!
নূতন হর্ষে নূতন বর্ষে নূতন বীর্য্য তেজে,
বিশ্ব রাজ্যে বিরাট কার্য্যে কিরীট পরে সে যে!
কেউ বা নৃপ শস্যাধিপ কেউ বা সলিলরাজ,
মেঘবাহন বজ্রদাহন বিশ্ব শাসন কাজ!
ঐক্যে সখ্যে দেব্‌তা তারা সবাই পূজে পায়,
(তোরা) অনৈক্যে যে অধম চণ্ডাল ছিন্ন শীর্ষকায়!
তাদের জ্যোতি পুণ্যস্পর্শে ধন্য ধরা হাসে,
তোদের মলিন পাপের ছায়া ছুঁইলে জাতি নাশে!
কে দৈবজ্ঞ জানে সে যজ্ঞ ওরে হিন্দু মোসলমান,
ছিন্ন মুণ্ড লাগ্‌বে যোড়া রাহু কেতু পাবে প্রাণ!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

বঙ্গদর্শন

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

(চৈত্র, ১৩২০, সংখ্যার বঙ্গদর্শনের ৮৪৫ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে শাব্দপ্রমাণ

প্রমাণত্রয়ের মধ্যে শাব্দপ্রমাণটী বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের প্রাণস্বরূপ। শাব্দপ্রমাণ ব্যতীতও, প্রত্যক্ষভাবে না হউক, পরোক্ষভাবেও আমরা ব্রহ্মতত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি। কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্বে বিশ্বাস করা অসাধ্য। ব্রহ্মতত্ত্ব সাধারণ তত্ত্ব. প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের দ্বারাই এ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। এমন কি, আমার মনে হয় যে শঙ্করবেদান্ত-সিদ্ধান্তে শাব্দপ্রমাণ স্বীকৃত হইলেও, অদ্বৈত-ব্রহ্মবস্তুর প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ এবং অনুমানই একরূপ পর্য্যাপ্ত প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। এই অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত নিরাকার ও নির্গুণ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম—ইহাই এ তত্ত্বের মূল কথা—মহাবাক্য। আর জগতের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপরেই এই সত্তামাত্রজ্ঞেয় অনন্ত-জ্ঞান-বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। আধুনিক যুগের অজ্ঞেয়তাবাদী বা এগনষ্টিক (agnostic) সম্প্রদায়, বিশেষতঃ ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের শিষ্যগণ, সকলেই শাব্দপ্রমাণ স্বীকার না করিয়াও, এই সত্তামাত্রজ্ঞেয় অনন্ত-জ্ঞান-বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। আর এই তত্ত্বেরই শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা গভীর সমাধিযোগে বেদান্ত যাহাকে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা লাভ করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ফলতঃ সর্ব্ব প্রকারের ইন্দ্রিয়-চেষ্টার ঐকান্তিক নিবৃত্তির নামই সমাধি। আর ইন্দ্রিয় বলিতে এখানে মন পর্য্যন্তও বুঝিতে হইবে। যোগ-শাস্ত্রে এই সমাধিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, এক নির্ব্বিকল্প, অপর সবিকল্প। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকারের দ্বৈতজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই সমাধির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উপনিষদ বলিয়াছেন, গভীর একত্বানুভূতি হইলে, কে, কা'কে, কি দিয়া দেখে? কে, কা'কে, কি দিয়া শোনে? ইত্যাদি। দেখা-শোনা এ কেবল বাহ্য বিষয়-রাজ্যেরই কথা নয়। তখন অন্তর্জড় এবং অতীন্দ্রিয় জগতেরও এ সকল দ্বৈতজ্ঞান থাকে না। এই সমাধির অবস্থাকে না জাগ্রত, না সুষুপ্তি, না-জাগ্রত-সুষুপ্তির মিশ্রণ, এ সকল কোনও কিছুই বলা

যায় না। ইহা অচেতনাবস্থা নয়, কারণ আত্মা চৈতন্যবস্তু, তার অচেতনাবস্থা-লাভ সম্ভবে না। চেতন ও অচেতন এই উভয় অবস্থা কেবল জড়ধর্ম্ম-সম্পন্ন অথচ আত্মচৈতন্য-উপহিত যে দেহ তারই ঘটিতে পারে। আত্মা যখন ইন্দ্রিয়ের দ্বার একান্ত রুদ্ধ করিয়া বহির্বিষয়ের সঙ্গে সর্ব্ববিধ সম্বন্ধের সম্ভাবনাকে পর্য্যন্ত উচ্ছেদ করিয়া, নিজ স্বরূপে স্থিতি করে, তখন বিষয়-বিষয়ী-জ্ঞান লুপ্ত হইলেও, তার চৈতন্যের লোপ হয় না। চৈতন্য থাকে বলিয়াই, নিদ্রাভঙ্গে জীব যেমন বলে, কি পরম সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, অথচ গভীর ঘুমে তার কোনও বাহ্যজ্ঞান থাকে না; সেইরূপ আত্মাও সমাধিভঙ্গে পুনরায় বিষয়রাজ্যে জাগ্রত হইয়া বলে—পরমানন্দ সম্ভোগ করিতেছিলাম। এই যে আনন্দ-স্মৃতি, ইহাই সমাধির অবস্থায়, জীবের সচেতন বা সজ্ঞান থাকার অকাট্য প্রমাণ। এই নির্ব্বিকল্প সমাধি যে সম্ভব, এ'কে যদি আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন বলে, তাহা হইলে এই আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যে জীবের ভাগ্যে ঘটিতে পারে, ইহার প্রামাণ্য-প্রতিষ্ঠার জন্য, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এবং এই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত অনুমান ও উপমান, এই ত্রিবিধ প্রমাণই পর্য্যাপ্ত। ইহার জন্য শাব্দপ্রমাণের কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না।

ফলতঃ এ দেশে এবং অপর দেশেও অনেক লোকে প্রকৃতপক্ষে শাব্দপ্রমাণ স্বীকার না করিয়াও, এরূপ সাধারণী ব্রহ্মদৃষ্টি বা আত্মদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। একটু সজীব কবিকল্পনা থাকিলেই, এই বিশ্ব-রচনা দেখিয়া বিশ্বের বিচিত্র জ্ঞান-প্রেম-লীলারসে নিমগ্ন হইয়া, আত্মহারা হওয়া নিতান্ত অসাধ্য নহে। নিসর্গের রূপদর্শনে মুগ্ধ হইয়া কত ভাবুক ও কত কবি বাহ্য চেতনা হারাইয়াছেন, এ কথা ধর্ম্মের ও সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজ-কবি পরলোকগত লর্ড টেনিসন বলিয়াছেন যে, নিজের নাম জপ করিতে করিতে তাঁর অনেক সময় বাহ্যলোপ হইয়া, এমন একটা অবস্থা ঘটিয়াছে, যাহাতে তিনি নিজেকে এক অনন্ত বিশ্বাত্মার সঙ্গে যুক্ত-ভাবে, মনশ্চক্ষুর দ্বারা প্রকাশ্যবৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে, তারই মধ্যে তাঁর আরাধ্য-দেবতা, সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্মের আবেশে এতটাই বিহ্বল হইয়া পড়িতেন যে, সে সময়ে তাঁর কোনও বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। অথচ লর্ড টেনিসন বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ইঁহাদের কেহই শাব্দপ্রমাণের অস্তিত্ব বা প্রয়োজন স্বীকার করিতেন না। ইঁহাদের উভয়েরই ধর্ম্মসিদ্ধান্ত শুদ্ধ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এবং অনুমান-উপমানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বেদান্তবিহিত ব্রহ্মোপাসনার দুই অঙ্গ। এক ব্যতিরেকী উপাসনা, অপর অন্বয়ী উপাসনা। "নেতি" "নেতি"—এই ব্যতিরেকী উপাসনার বিধান বা প্রণালী।

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যচ্ছোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

এই সকল শ্রুতি সাহায্যে ব্যতিরেকী উপাসনা করিতে হয়। ব্রহ্মবস্তু অতীন্দ্রিয়, অবাঙমনসগোচর—চক্ষে যাহা দেখা যায় তাহা তিনি নহেন; কর্ণে যাহা শোনা যায় তাহা তিনি নহেন; ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা আঘ্রাণ করা যায়, তাহা তিনি নহেন; বাক্যের দ্বারা যাহা প্রকাশ করা যায়, তাহা তিনি নহেন; মনের দ্বারা যাহা মনন করা যায়, তাহা তিনি নহেন; প্রাকৃত জনে যে সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিমিত পদার্থকে ব্রহ্ম বলিয়া ভজনা করে, তাহা তিনি নহেন। এইভাবে ব্রহ্মবস্তুর চিন্তা করাই ব্যতিরেকী উপাসনা। আবার সমুদয় বিষয়রাজ্যকে এইরূপভাবে ব্রহ্মেতর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া, এ সকল যে তিনি নহেন এই জ্ঞান ও প্রতীতি দৃঢ় হইলে, পুনরায়, এ সকলেরই অন্তরে ও অন্তরালে, এ সকলের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠারূপে সেই ব্রহ্মবস্তুরই চিন্তা করা—অন্বয়ী উপাসনা। যিনি বাক্যের দ্বারা অভিব্যক্ত হন না, তিনিই বাক্যের অভিব্যক্তা—তাঁরই প্রকাশে বাক্য অর্থের অনুসরণ করে ও বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকে; যিনি মনের মন্তব্য নহেন, মন যাঁহাকে মনন করিয়া পায় না, তিনিই আবার মনের মননের ভিত্তি ও শক্তি, মনোমধ্যে তিনিই চিন্তামণি, তাঁরই প্রকাশে এই মন যাবতীয় মন্তব্যের মনন করিয়া থাকে; চক্ষু যাহাকে দেখিতে পায় না, তিনিই চক্ষুষশ্চক্ষুঃ—চক্ষুর চক্ষু; তাঁরই প্রকাশে চক্ষু যাবতীয় দৃশ্যদর্শনে সমর্থ হয়; যিনি শ্রবণের গ্রাহ্য নহেন, যাঁহাকে শোনা যায় না, তিনিই আবার শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং;—এইরূপে, যিনি সর্বেন্দ্রিয়ের অগোচর, তিনিই আবার সর্বেন্দ্রিয়ের গুণাভাষ; এই সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সেই ইন্দ্রিয়াতীত পরমতত্ত্বকেই চিন্তা করিতে হইবে;—যিনি জগতের অতীত তাঁহাকে এই জাগতিক দৃশ্য ও বস্তুর মধ্যেই চিন্তা করিতে হইবে, যিনি দেশকালাতীত তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই দেশ ও কাল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এইভাবে নিরাকার ও নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের অনুধ্যানই অন্বয়ী উপাসনা। এই ব্যতিরেকী উপাসনা—নেতি, নেতি যার মন্ত্র; আর এই অন্বয়ী উপাসনা—ঈশাবাস্যং ইদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—যার উপদেশ; এই উভয়বিধ উপাসনাই প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। আধুনিক অজ্ঞেয়তাবাদ বা agnosticismকে আমরা কেবল একটা দার্শনিক সিদ্ধান্ত বলিয়াই জানি। সাধনের দ্বারা যদি এই সিদ্ধান্তকে অন্তরে প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, এই সিদ্ধান্তকে যদি ধর্ম্মরূপে গড়িয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের প্রাচীন বেদান্তের এই ব্যতিরেকী ও অন্বয়ী উপাসনা অবলম্বন ও অভ্যাস করিতে হইবে। এই ব্যতিরেকী প্রণালীর দ্বারা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়; আর এই অন্বয়ী প্রণালীর দ্বারা সেই অজ্ঞেয়, অজ্ঞাত—সেই unknown এবং unknowable তত্ত্বই রসস্বরূপ, আনন্দহেতু হইয়া, প্রেম ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মভাবের উপজীব্য হইয়া উঠেন। তাহা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইতে জীবসকল জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে, তিনি পিতা—তিনি এই চরাচর বিশ্বের পিতা। "পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু" বলিয়া ভক্তিভরে তাঁর

চরণে প্রণাম করি। তিনিই রসস্বরূপ—"রসো বৈ সঃ," "রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি"—তাঁর রস পাইয়াই জীব আনন্দিত হয়। জীবের আনন্দবিধান তিনিই করিতেছেন; "এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রামুপজীবন্তি"—তাঁরই আনন্দকণা বাঁটিয়া লইয়া আমরা যত জীব জগতে আনন্দভোগ করিতেছি। তিনি সখা, তিনি সুহৃৎ, তিনি বন্ধু, তিনি নাথ। তাঁহাকে প্রাণের শ্রেষ্ঠতম প্রীতি অর্পণ করিয়াও তৃপ্তি হয় না। তিনি ঈশ্বর—নিয়ন্তা। বিশ্বের নিয়ন্তা, জীবের ভাগ্যবিধাতা। সুখ-দুঃখ তাঁর হাতে। মুক্তি-বন্ধন তাঁর উপরে নির্ভর করে। তিনিই জীবের পরম গতি। তিনিই জীবের পরম সম্পৎ। তিনিই জীবের পরম লোক। তিনিই জীবের পরম আনন্দ। এই সকলের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—অন্বয়ী উপাসনার অঙ্গ। এই সকলে যখন, বারম্বার মনন ও অবিরত ধ্যান নিবন্ধন, প্রত্যক্ষবং বিশ্বাস বা আস্থা জন্মিয়া যায়, তখন এই ব্যতিরেকী-অন্বয়ী-উপাসনা-সিদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব সবিকল্প সমাধির আশ্রয় পর্য্যন্ত হইতে পারেন। আর এই ব্রহ্মতত্ত্বের ধ্যানে একান্ত ডুবিয়া গিয়া, সাধকের অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিকী ভাবেরও প্রকাশ হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। বৈদান্তিক সাধকের মধ্যে এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু এ সকল ধর্ম্মের অতি উচ্চাবস্থা হইলেও, যে সিদ্ধান্তের উপরে এ সাধন ও সিদ্ধি গড়িয়া উঠে, তাহা প্রকৃতপক্ষে নিরাকার অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ একরূপ agnostic সিদ্ধান্তও হইতে পারে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠার জন্য শাব্দপ্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ অত্যাবশ্যক নহে।

যাহা প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না, তারই জন্য শাব্দপ্রমাণ প্রয়োজন। কিন্তু একদিকে উপনিষদের অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব এবং অন্যদিকে যোগীজনারাধ্য পরমাত্ম-তত্ত্ব, এই উভয় তত্ত্বই প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের দ্বারা একরূপ প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। যাঁরা শাব্দপ্রমাণ অস্বীকার করেন, তাঁরাও এই দুই তত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আর তাঁহাদের এই বিশ্বাস যে নিতান্ত বংশানুক্রমাগত সংস্কারের উপরে প্রতিষ্ঠিত, এমনও বলা যায় না। আমরা সর্ব্বসংস্কার বর্জ্জন করিয়াও, কেবল বিচার-যুক্তির দ্বারাই, এরূপ ব্রহ্মতত্ত্বে ও পরমাত্মতত্ত্বে বিশ্বাসলাভ করিয়াছি। জগদালোচনা করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বে, এবং নিজ নিজ জীবনের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার আলোচনা করিয়া, মনস্তত্ত্বের সাহায্যে, এই পরমাত্ম-তত্ত্বে উপনীত হইতে পারি। ব্রহ্মতত্ত্বে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিষ্ঠা। যাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাতে ব্রহ্মাণ্ড স্থিতি করিতেছে, যাহাকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্ত্তন-স্রোত,—নদী যেমন সমুদ্র-মুখে ধাবিত হইয়া, তাহাতে প্রবেশ করে,—সেইরূপ যাহার প্রতি ধাবিত হইয়া, তাহাতে বিরাম বা বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম। জগতের জন্ম-আদি হইতেই এই ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রহ্মতত্ত্বে যেমন ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিষ্ঠা; সেইরূপ পরমাত্মাতে—আমরা যাহাকে "আমি" "আমি" বলি, সেই অহংপ্রত্যয়-বাচক আত্ম-বস্তুর প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মাণ্ডকে জানিতে গিয়াই ব্রহ্মকে জানিতে হয়। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্ পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবি ব চক্ষুরাততম্।"—আয়তনবিশিষ্ট পদার্থকে দেখিতে গেলেই যেমন তার সঙ্গে সঙ্গে যে

আকাশ বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তাহাকেও সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে হয়, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডকে জানিতে গেলেই ব্রহ্মকে জানিতে হয়। সেইরূপ নিজ নিজ আত্মাকে জানিতে গেলেই পরমাত্মাকেও জানিতে হয়। এই পরমাত্মাই সাক্ষী চৈতন্য। "আমি" "আমি" বলি, কিন্তু এই "আমি" কে তা' ভাল করিয়া কখনও তলাইয়া দেখি না। এই "আমি" আমার বাল্যে ছিল, বাল্যের পূর্ব্বে অপোগণ্ড শিশু যখন ছিলাম, তখনও ছিল; তারও পূর্ব্বে মাতৃগর্ভে যখন ভ্রূণমাত্র ছিলাম তখনও ছিল, কারণ তারই জন্য বলি "আমি" অমুক দিনে, অমুক স্থানে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম। এই "আমি" যৌবনে ছিলাম, এই "আমি" প্রৌঢ়ে ছিলাম, এই "আমি" বার্দ্ধক্যে আছি। সে কাল আর এ কালে কত তফাৎ। সে শরীর নাই, সে অবস্থা নাই। আর প্রতিদিনও যখন ঘুমাইয়া পড়ি, যখন স্বপ্ন দেখি, যখন জাগিয়া উঠি, এ সকল অবস্থার মধ্যে এই "আমি" থাকে। এই 'আমি' ঘুমাইয়াও আবার জাগ্রতের স্মৃতিকে বুকে করিয়া থাকে, জাগিয়াও নিদ্রাবস্থার স্মৃতিকে পরিত্যাগ করে না। এই 'আমিই' তো আমার শৈশব, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থান্তরের সাক্ষী। এই 'আমিই' তো আমার নিদ্রা, স্বপ্ন, জাগ্রতের সাক্ষী। এই 'আমিই' তো আমার সুখ-দুঃখের, আমার পাপপুণ্যের সাক্ষী। সাক্ষী কখনও সাক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে এক হইতে পারে না; এক হইয়া গেলে সে সাক্ষ্য দিবে কার ও কিসের? নদীর জলের জোয়ার-ভাঁটার পরিমাণ করিবার জন্য যেখানে এক একটা মাপখুঁটী থাকে, সে মাপখুঁটীগুলো যদি জোয়ারের সঙ্গে নিজেরাও বাড়িয়া উঠে ও ভাঁটার সঙ্গে আবার নামিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা কি কখনও জলের হ্রাস-বৃদ্ধির কথা কেহ জানিতে পারে? জল বাড়ে, কিন্তু সে খুঁটীটী যেমন ছিল তেমনি দাঁড়াইয়া থাকে। জল কমে, কিন্তু তাতে সে খুঁটীটী বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। পরিবর্ত্তনের মুখে আপনি অপরিবর্ত্তিত থাকে বলিয়াই, এই মাপখুঁটীগুলি জলের হ্রাস-বৃদ্ধির সাক্ষ্য দান করিতে পারে। সেইরূপ এই আমি-বস্তু, বা আত্মবস্তু, এই অহংপ্রত্যয়বাচক বস্তু, আমাদের জীবনের সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনের মধ্যে আপনি অপরিবর্ত্তিত থাকিয়াই কেবল এই সকল অসংখ্য পরিবর্ত্তনের সাক্ষ্য দান করে, এই আমিই সাক্ষীচৈতন্য। এই সাক্ষীচৈতন্যই পরমাত্মা। ইহাই অন্তর্যামী পুরুষ। এই আমি কিন্তু বড় আমি, তার সঙ্গে একটা ছোট আমি মিলিয়া মিশিয়া আছে। সেই ছোটআমি আমার দেহ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এ সকল উপাদানে গঠিত। অহং তত্ত্ব পর্য্যন্ত এই ছোট 'আমি'র অন্তর্গত। অহংতত্ত্ব পর্য্যন্ত সংকল্প-বিকল্পের অধীন, পরিবর্ত্তনশীল। আর, আয়তনবিশিষ্ট বস্তু মাত্রেই যেমন আকাশে স্থিতি করে, আয়তন দেখিলেই যেমন অদৃশ্য আকাশকেও তার সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে হয়। সেইরূপ পরিবর্ত্তন মাত্রেই যাহা পরিবর্ত্তনের অতীত এমন কোনও কিছুর সঙ্গে যুক্ত থাকে। আলোক ভিন্ন যেমন ছায়ার সৃষ্টি হয় না, হইতেই পারে না; সেইরূপ নিত্যত্ব ভিন্ন পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় না, হইতেই পারে না। নিত্যই কেবল পরিবর্ত্তনের সাক্ষ্য দান করে। অতএব পরিবর্ত্তনের অধীন এই যে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারসমন্বিত মায়োপহিত আমি বস্তু, তাহার সঙ্গে নিত্য-

যুক্ত হইয়াই, এ সকল পরিবর্ত্তনের সাক্ষীরূপে পরমাত্মা বা অন্তর্যামী পুরুষ নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন। এই যে পরমাত্ম-তত্ত্ব ইহাকে জানিবার ও বুঝিবার জন্যও শাস্ত্র-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যক্ষ পরিবর্ত্তনের উপরে উপমান-অনুমানাদি প্রমাণ-প্রয়োগেই এই পরমাত্ম-বস্তু বা অন্তর্যামী পুরুষের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বা যোগীজনারাধ্য* পরমাত্মতত্ত্ব, উভয়ই, এই জন্য, প্রকৃতপক্ষে শাব্দ-প্রমাণের অপেক্ষা রাখেন না। ব্রহ্মতত্ত্ব এবং পরমাত্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ ও অনুমানই পর্য্যাপ্ত।

যতদিন পরমতত্ত্বকে ব্রহ্মভাবে বা পরমাত্মাভাবে দেখিতেছিলাম, ততদিন, এই জন্য, শাব্দপ্রমাণের মূল্য ও প্রয়োজন যে কি ইহা বুঝি নাই। ব্রাহ্মসমাজের সিদ্ধান্ত ও সাধনা এই পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি আমাদের ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠতম সাধক ও মহাজনেরা ব্রহ্মভাবে বা পরমাত্মাভাবেই পরমতত্ত্বের আলোচনা ও অনুশীলন করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ভাবে তাঁর ভজনা করিবার অধিকার লাভ করেন নাই। এ অধিকার কেবল প্রকৃত বৈষ্ণব যাঁর' তাঁদেরই আছে। আর এই জন্য বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে শাব্দপ্রমাণের যে স্থান ও মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত, ব্রাহ্মসিদ্ধান্তে তাহা হয় নাই এবং হইবেও না। এমন কি, আমার মনে হয়, কেবল গতানুগতিক-ভাবেই বৈদান্তিক সাধনে ও শঙ্কর-বেদান্তা-বলম্বী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় মধ্যে, শাব্দপ্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। ভগবান ভাষ্যকার শঙ্করকে কখনও কোথাও অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করেন নাই, ইহা সত্য, কিন্তু তিনি যে ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছেন, তাহা যে শাব্দপ্রমাণ ব্যতিরেকে সম্যক প্রতিষ্ঠিত হয় না, তাঁর দর্শনে এমন কোনও সিদ্ধান্তের হেতু পাওয়া যায় না। কিন্তু বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত এই বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হয় না।

আমাদের আধুনিক ব্রাহ্মসিদ্ধান্ত ও পুরাতন বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত উভয়ই নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত, বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের পরমতত্ত্ব নিরাকার নহে, কিন্তু চিদাকার। মহাপ্রভু স্বয়ং এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন:—

ব্রহ্মশব্দ মুখ্য অর্থে কহে ভগবান।
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥
তাঁহার বিভূতি, দেহ, সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার॥

এখানে অধিকাংশ শব্দই একান্ত অতীন্দ্রিয়-তত্ত্বের দ্যোতনা করিতেছে। জগতের জন্ম-আদি হইতে, তটস্থ লক্ষণার দ্বারা, যে ভাবে, ব্রহ্ম-বস্তু যে কি, ইহা আমরা বুঝিতে পারি, বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত ব্যতিরেকী ও অন্বয়ী উপাসনার দ্বারা যে ব্রহ্মের ভজনা পর্য্যন্ত করা সম্ভব হয়, সে ভাবে, সেইরূপ তটস্থ লক্ষণের দ্বারা, আমরা ভগবান-তত্ত্ব যে কি, তাহা কিছুতেই জানিতে ও বুঝিতে পারি না। ব্রহ্মবস্তু নির্ব্বিশেষ, ইংরাজিতে তাহাকে Impersonal বলা যায়। কেহ কেহ আজি-কালি পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে Super-Personal শব্দও ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কিন্তু Impersonalই বল আর Super-Personalই বল, এ বস্তু নিরাকার ও অপরিচ্ছিন্ন, "তিলেষু তৈলং দধিনিব সর্পিঃ স্রোতেষ্বাপঃ অরণীষু অগ্নিঃ" তিলেতে তৈলের, দধিতে ঘৃতের, শুষ্কনদীগর্ভে জলের এবং অরণীতে অগ্নির মতন,—সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ও অদৃশ্য হইয়া আছে। কিন্তু ভগবান অতীন্দ্রিয় এবং জড়ধর্ম্মবিহীন হইলেও, এরূপ একটা কেবল ব্যাপক বস্তু নহেন। তিনি Impersonal নহেন, কিন্তু Personal; কেবল শক্তি নহেন, কিন্তু শক্তিমান পুরুষ; চিৎস্বরূপমাত্র নহেন, কিন্তু চেতনাবান পুরুষ; নির্গুণ নহেন, কিন্তু সর্ব্বগুণাধার; তিনি বিদেহী নহেন, দেহী; তবে সে দেহ চিদাকার। এই যে পুরুষতত্ত্ব, ইহা অতীন্দ্রিয় বলিয়া প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নহে। এই তত্ত্বকে চক্ষুষশ্চক্ষুঃ শ্রোতস্য শ্রোত্রং উত প্রাণস্য প্রাণম্ বলিয়া, আমাদের দর্শন-শ্রবণাদির মূলে অনুভব করিয়াও প্রত্যক্ষ করা যায় না। এই গুলিতে আত্মভাব পরিত্যাগ করিতেই উপনিষদ উপদেশ দিয়াছেন। পণ্ডিতেরা চক্ষুশ্রোত্রাদিতে আমি, এবং আমার বুদ্ধি পরিহার করিয়াই, মরণান্তে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু ভগবদ্দর্শনলাভ হয় না। পুরাতন বৈদান্তিক সাধনায়, বা আধুনিক ব্রাহ্মসিদ্ধান্তে এই ভগবত্তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। বৈষ্ণবেরাই কেবল এই তত্ত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ ও অনুমান ব্যতীত শাব্দপ্রমাণ আশ্রয় করা অপরিহার্য্য। বৈদান্তিকের বা ব্রাহ্মের নিকটে শব্দের যে প্রামাণ্য নাই, বৈষ্ণবের নিকটে তাহা আছে। এই জন্যই বৈষ্ণবসাধনায় শাস্ত্র ও গুরুর এতটা প্রাধান্যলাভ হইয়াছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

চিত্র-পরিচয়

শিল্পকলার অনুশীলনে কিম্বা শিল্পকলা সম্বন্ধীয় সাহিত্যের আলোচনায় যাঁরা আনন্দ-লাভ করেন, তারা আগ্রহসহকারেই বৈশাখের ভারতীতে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিবেন। ইহাতে জানিবার ও ভাবিবার অনেক কথা আছে। তবে লেখক যে সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন, সকলে তাহা গ্রহণ করিবে কি না, বলিতে পারি না। সে সিদ্ধান্তটী এই যে, ভারতের প্রাচীন আলেখ্যের বিধান "বাঁধা ঘাটের মত সুচারু-ভাবে ধাপে ধাপে সজ্জিত ও সুনির্ম্মিত;" এবং চীনের চিত্র-কলা এরূপ বাঁধাবাঁধির কড়াকড়ি অপেক্ষা "প্রাণের ছন্দ"কেই সমধিক আশ্রয় করিয়া চলিয়াছে। ভারতের আলেখ্য-বিধান "যেন চিত্রের দিক দিয়া", আর চীনের বিধান "যেন চিত্রকরের দিক্ দিয়া" ব্যাপারটার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সংক্ষেপ সমালোচনায় এত বড় বিষয়ের সরাসরি বিচার সম্ভবে না। চীনের আলেখ্য-তত্ত্বের প্রকৃত

মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, চীনের চিত্র-শিল্পের প্রত্যক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিতে হয়। আমরা চীনের ছবি ক'খানাই বা দেখিয়াছি? আধুনিক জাপানী চিত্রকরদের দু'এক খানা ছবি যাহা দেখিয়াছি, তাহা হইতে কোনও বিশিষ্ট তত্ত্বে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দেশের প্রাচীন-শিল্পচর্চ্চার বা চিত্রলেখারই বা ক'খানা আমাদের নিকটে পৌছিয়াছে? যাহা পাওয়া যায়, তাহাও সবে মাত্র সাধারণ্যে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং অবনীন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্তের সম্যক ও সবিস্তার আলোচনা করিবার উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম আমাদের নাই। তবে এদেশের রসতত্ত্বের সম্বন্ধে যাঁদের যৎসামান্য জ্ঞান আছে, তাঁরাও ভারতের প্রাচীন আলেখ্য-বিদ্যাকে নিতান্ত প্রাণহীন বা প্রাণছন্দ (Rythmic Vitality)-হীন বলিয়া মনে করিতে পারেন না। অবনীন্দ্র বাবু "চিত্র-ষড়ঙ্গ" সম্বন্ধে যে শ্লোকটী উদ্ধার করিয়া তাঁর প্রবন্ধের পত্তন করিয়াছেন, সে শ্লোকটীই ইহার প্রমাণ। শ্লোকটী এই :—

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম॥

(১) রূপভেদ, (২) প্রমাণ, (৩) ভাব, (৪) লাবণ্যযোজন, (৫) সাদৃশ্য, (৬) বর্ণিকাভঙ্গ; —আলেখ্যের এই ছয় অঙ্গ। অবনীন্দ্র বাবু চীন দেশের ষড়ঙ্গও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—(১) Spiritual tone and life-movement, (২) Manner of brush work in drawing lines, (৩) Form *in relation to objects,* (৪) *Choice of colours appropriate to the* objects, (৫) Composition and Grouping, (৬) Copying of classic models. চীনভাষা আমরা জানি না; এই অনুবাদ কতটা সত্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না। অবনীন্দ্র বাবু নিজেই বলিতেছেন যে, এই ইংরাজী অনুবাদের সহিত চীন-ভাষাবিদ্ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের ও জাপানের সুবিখ্যাত শিল্পী স্বর্গগত ওকাকুরার অনুবাদের সম্পূর্ণ মিল নাই। তাই তিনি অন্য অনুবাদও উদ্ধার করিয়াছেন। Giles সাহেবের অনুবাদটী উল্লেখযোগ্য :—(1) Rythmic vitality, (2) Anatomical structure, (3) Conformity with nature, (4) Suitability of colouring, (5) Artistic composition, (6) Finish. আর ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদের মধ্যে এই বৈসাদৃশ্য আছে বলিয়াই, সহসা চীনের আলেখ্য-তত্ত্বের প্রকৃত মর্ম্মটা যে কি, তৎসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। কিন্তু চীনের 'ষড়ঙ্গে'র কথা যাই হউক না কেন, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রোল্লিখিত "ষড়ঙ্গেরই" প্রকৃত ও পরিস্ফুট ধারণা করা সহজ, এমন নহে। অবনীন্দ্র বাবু এগুলিকে চিত্রকলার canons বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চীনের 'ষড়ঙ্গ' সম্বন্ধে canons শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যে বিধান ও নিয়মের দ্বারা চিত্র ঠিক না অ-ঠিক, ভাল না মন্দ, ইহা নির্দ্ধারিত হয়, যাহার অনুসরণ না করিলে উৎকৃষ্ট চিত্র-রচনা সম্ভব হয় না,—তাহাই canons. কিন্তু কোনও বস্তুর অঙ্গ নির্দ্দেশ করা, আর তার canons প্রতিষ্ঠা করা, এক কথা নহে। বেদের ষড়ঙ্গ আছে, কিন্তু শিক্ষাকল্প-

ব্যাকরণাদিকে বেদের six canons বলা যায় কি? মানুষের হস্তপদাদি অঙ্গ আছে, কিন্তু এগুলিকে canon বলা যায় না। অঙ্গের সমাবেশে অঙ্গীর প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ হয়, অঙ্গ ও অঙ্গীর পরস্পরের নিত্য ও আকস্মিক সম্বন্ধের বিচার হইতে, অঙ্গীজীবনের canon-এর প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। অঙ্গনির্দ্দেশ ও canon-প্রতিষ্ঠার মধ্যে এই সূক্ষ্ম বৈষম্যটা আছে। চীনের চিত্র-ষড়ঙ্গের সঙ্গে ভারতের আলেখ্যের ষড়ঙ্গেরও এই সূক্ষ্ম বৈষম্যটা আছে। অবনীন্দ্র বাবু আমাদের আলেখ্যের ষড়ঙ্গের এরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :—

(১) রূপভেদাঃ—Knowledge of appearances.

(২) প্রমাণানি—Correct precep-tion, measure and structure of forms.

(৩) ভাব—The action of feelings or forms.

(৪) লাবণ্যযোজনম্—Infusion of grace, artistic representa-tion.

(৫) সাদৃশ্যং—Similitudes.

(৬) বর্ণিকাভঙ্গ—Artistic manner of using the brush and colours.

বিশেষজ্ঞেরা এই অনুবাদ সম্বন্ধে কি বলিবেন জানি না; কিন্তু সামান্য বুদ্ধিতে এ অনুবাদ যথাযথ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রথম রূপভেদাঃ কি Knowledge of appearances? যে বস্তুটা যেমন দেখা যায় তাকে সেইরূপ জানাই knowledge of appearances. কিন্তু এ তো বাহিরের, অতি বাহিরের কথা। এইরূপ জ্ঞানের উপরে রসমূর্ত্তি রচিত হয় না, হইতেই পারে না। আর 'রূপভেদাঃ'র মধ্যে knowledgeই বা এখানে আসে কোথায়? মোট কথা এই যে, অবনীন্দ্র বাবু এখানে আমাদের প্রাচীন আলেখ্য-বিদ্যা-বর্ণিত, চিত্র ষড়ঙ্গকে canons of paint-ing বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। সুতরাং knowledge, perception প্রভৃতি চিত্র-করের বিশেষত্ব যাহা থাকা প্রয়োজন, তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন ফলতঃ এখানে চিত্রে বা আলেখ্যে কি থাকা চাই, এই ষড়ঙ্গ তারই নির্দ্দেশ করিতেছে, কোনও canon প্রতিষ্ঠা করে নাই। এইভাবে দেখিতে গেলে, কথাগুলি সহজেই বোঝা যায়, বিশেষজ্ঞ না হইয়াও বুঝিতে কোনও গোলমাল লাগে না। "রূপভেদাঃ"—অর্থ রূপের বিভিন্নতা বা বিশিষ্টতা, আলেখ্যে যে বস্তু অঙ্কিত হইয়াছে, তার সজাতীয় অপর সকল বস্তু হইতে যে এই বস্তুটা ভিন্ন, তার যে একটা বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য আছে, ইহাই আলেখ্যের প্রথম অঙ্গ। 'রূপভেদাঃ'র ইংরেজি অনুবাদ করিতে গেলে "Distinctive individualities of the objects (painted)" ইহাই বলিতে হয়। তার পর 'প্রমাণানি'—যার দ্বারা কোনও বস্তুর বিশিষ্ট পরিমাণ করা যায় তাই তার প্রমাণ। রূপ মাত্রেই অঙ্গীপর্য্যায়ভুক্ত, বস্তুবিশেষের বিশিষ্টত্বই তার রূপ, ইহার দ্বারাই সে যে একটা বস্তু ইহা জানা যায়। কিন্তু এ একত্ব নির্ব্বিশেষ একত্ব নহে; নির্ব্বিশেষ এক যাহা, তাহা অরূপ। সবিশেষ একত্বই রূপ প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করে। আর বস্তুর ভিন্ন

ভিন্ন অংশের বা অঙ্গের বা উপাদানের পরস্পরের সঙ্গে যে বিশিষ্ট সম্বন্ধ, তাহাই তার প্রমাণ, তার বস্তুত্বের, বিশিষ্টত্বের, তার একত্বের, তার individualtyর এবং unityর প্রতিষ্ঠা। এই সকল বিশিষ্ট সম্বন্ধের দ্বারাই রূপভেদের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়। এইজন্য আলেখ্যের দ্বিতীয় অঙ্গ "প্রমাণানি।" কিন্তু কেবল এই দুই অঙ্গে আলেখ্য পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয় না। প্রমাণপ্রতিষ্ঠ রূপের মধ্যে 'ভাবে'র ক্রিয়া প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। যে প্রাণছন্দ বা Rhythmic vitality অবনীন্দ্র বাবু আমাদের চিত্র ষড়ঙ্গের প্রথম অঙ্গে—রূপভেদাঃর মধ্যে—খুঁজিয়াছেন, তাহাকে এখানে, এই "ভাবের" ক্রিয়াতে পাইবেন। তাহাই সত্য পাওয়া হইবে। গতি বা motion ছন্দের প্রাণ। বিশেষতঃ রূপের গতির উৎপত্তি—ভাবে; motionএর জন্ম—emotionএ। কিন্তু ইহাতেও চিত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। ভাবের উপরে লাবণ্য যোজনা করা আবশ্যক। রূপ ও প্রমাণকে আশ্রয় করিয়া ভাব এরূপ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে যে, তাহাতে দ্রষ্টার চিত্ত আকর্ষিত হয়। চিত্তাকর্ষণই লাবণ্যের ধর্ম্ম। আর চিত্তরঞ্জনই ললিতকলার মুখ্য উদ্দেশ্য। চিত্রের পঞ্চম অঙ্গ—সাদৃশ্যং। সাদৃশ্য কার সঙ্গে? লাবণ্যের সঙ্গে ভাবের; লাবণ্য ও ভাবের সঙ্গে প্রমাণানির; লাবণ্য, ভাব ও প্রমাণানির সঙ্গে রূপের—সাদৃশ্য বুঝিতে হইবে চিত্রের সঙ্গে চিত্রিত মূল বস্তুর সাদৃশ্য বুঝিলেই তাহাকে Similitude বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা বাহিরের কথা। রূপভেদাঃ এবং প্রমাণানির দ্বারাই আলেখ্যের সঙ্গে আলেখিত বস্তুর সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাদৃশ্যকে চিত্রের পঞ্চম অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করা সম্ভব নয় এইজন্য সাদৃশ্যকে বোধ হয় harmony বলিলেই ভাল হয়। আর বর্ণিকাভঙ্গকেও mannerএর দিকে দৃষ্টি না করিয়া, matterএর দিকে দৃষ্টি করিয়া, আলো-আঁধারের বা light and shadeএর যথাযোগ্য সমাবেশ বলিয়া গ্রহণ করিলে অন্ততঃ আমাদের মতন সাধারণ লোকের সমধিক মনঃপূত হয়। এই চিত্র-ষড়ঙ্গের ব্যাখ্যাতে অবনীন্দ্র বাবুর এই প্রবন্ধটী এক-দিকে যেমন উপাদেয়, সেইরূপ সময়োপযোগী হইয়াছে। এই চিত্র-ষড়ঙ্গের আলোচনার পরে, কেহ যেন বৈশাখের ভারতীর "শকুন্তলা"-অভিধেয় ত্রিবর্ণচিত্রখানি দেখেন না, আমার এই অনুরোধ। কারণ এই অদ্ভুত শকুন্তলা-আলেখ্যে এই ষড়ঙ্গের সকল অঙ্গই নির্ম্মমভাবে নিপীড়িত হইয়াছে। অবনীন্দ্র বাবুর "পরিচয়" পড়িয়া এই চিত্রের চিত্রত্বের কোন পরিচয়ই আমরা পাইলাম না। তবে অবনীন্দ্র বাবু যদি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেন, কৃতার্থ হইব।

শ্রী:—

মহাভারত

মহা-প্রস্থান

(বৰ্দ্ধমান-অনুবাদ হইতে সংকলিত)

যুধিষ্ঠির যুযুৎসুকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া পরীক্ষিৎকে হস্তিনার সিংহাসনে এবং যদুবংশীয় বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে বসাইয়া বালক পরীক্ষিৎকে শিষ্যরূপে গুরু কৃপাচার্য্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

অনন্তর পঞ্চভ্রাতা, কৃষ্ণা ও একটী কুকুর এই সাত জনে হস্তিনানগর হইতে পূর্ব্ব অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা উদয়-অচলের প্রান্তস্থিত লোহিত সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মূর্ত্তিমান হুতাশন পুরুষ-বিগ্রহ পরিগ্রহ করত মহীধরের পথ অবরোধ করিয়া সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন। অগ্নি কহিলেন—বরুণদেবের গাণ্ডীব ধনু তাঁহাকে প্রদত্ত হউক ; অর্জ্জুন সেই ধনু ও অক্ষয় তূণযুগল জল মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

তৎপরে পাণ্ডবগণ দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন। তাঁহারা লবণ সমুদ্রের উত্তর তীর ধরিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রস্থান করিলেন। প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পশ্চিম অভিমুখে গমন করত তাঁহারা দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন এবং পশ্চিম দিক্ হইতে পুনরাগমন করত: উত্তর অভিমুখে চলিলেন। এইরূপে তাঁহারা হিমবান্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া বালুকার্ণব পার হইলেন এবং সুমেরু শিখরে উপনীত হইলেন। সুমেরু শিখর আরোহণ করিতে করিতে কৃষ্ণা পতিত হইলেন। ক্রমে সহদেব নকুল অর্জ্জুন ও ভীম পতিত হইলে একমাত্র কুকুরই যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিল।

দেবরাজ রথ-আরোহণে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে রথে উঠিতে বলিলেন। চিরভক্ত কুকুরকে সঙ্গে লইয়া যুধিষ্ঠির স্বর্গে যাইতে বাসনা করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন—তুমি মর্ত্ত্যভাববিহীন হইয়া আমার সদৃশ হইয়াছ, কুকুর ত্যাগ কর।" যুধিষ্ঠির তাহাতে সম্মত হইলেন না।

অনন্তর ধর্ম্ম ইন্দ্র মরুৎগণ যুধিষ্ঠিরকে রথমধ্যে আরোপণ করত গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিলেন এবং ক্রমে স্বর্গলোকে উপনীত হইলেন।

জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহ।

আকাশে যে ধ্রুব চক্র আছে। উহার পরিধিতে স্থিত চতুর্দ্দশ তারা চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের চতুর্দ্দশ মনু বা ধ্রুবতারা। তারাগুলি একে একে পর্য্যায়ক্রমে ধ্রুবসিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক ধ্রুবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং কিছুকাল পরে ধ্রুবপদ হইতে চ্যুত হয়। ২৭ হাজার বর্ষে চতুর্দ্দশ ধ্রুবতারার বা মনুর ধ্রুবত্বের শেষ হইলে যুগ-চতুষ্টয় পূর্ণ হয় এবং প্রলয় উপস্থিত হয়। এক এক ধ্রুবতারার ধ্রুবত্বের অবসানে মনু-অন্তর উপস্থিত হয়। এই রূপে চতুর্দ্দশ মনু-অন্তরের অন্তে প্রলয়-কাল উপস্থিত হয়। আবার একে একে ঐ তারাগণ ধ্রুবপদে অভিষিক্ত হয়। এই ধ্রুবচক্র ঋক্‌বেদের পরমপদ বা উত্তানপদ। ত্রিসন্ধ্যাকালে দ্বিজগণ এই "তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"

সন্দর্শনে চিত্ত ও দেহ পূত ও পবিত্র করেন। এই পরমপদে তারা শিশুমার ও তারা-সর্প তক্ষক বা নহুষ বিরাজমান আছে।

তারা শিশুমারের পুচ্ছে বর্ত্তমান ধ্রুব তারা :—"ধ্রুবঃ পুচ্ছে ব্যবস্থিত ;"

এবং তারা শিশুমারের শিরে ধর্ম্ম তারা :— "ধর্ম্ম মূর্দ্ধানম্ আশ্রিতঃ ;"

এবং তারা শিশুমারের পূর্ব্বপাদযুগলের অন্যতর পদে দেবরাজ ইন্দ্র অধিষ্ঠিত আছে :— বরুণেন্দ্রৌ পূর্ব্বপাদয়োঃ।

তারা শিশুমারের তারা-সপ্তক কুকুর-লাঙ্গুল গঠন করে। তারা তক্ষকের লাঙ্গুল স্থিত ৭ তক্ষকস্থ তারা ধ্রুবসিংহাসনে আরোহণ করিয়া কলিযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। এই তারা ঋক্-বেদে যম, পুরাণে "ধর্ম্মরাজঃ পিতৃপতিঃ", বেবিলন নগরে "তীর—অন্ন" (স্বর্গের বিচারপতি) এবং কাল্‌ডিয়াতে "দেযান্—সমে"(ঐ) উপাধি লাভ করিয়াছিল।

ধর্ম্মরাজ তারার অদূর পশ্চিমে অতি ক্ষুদ্র তারা ১৪ তক্ষকস্থ টিপ টিপ করিতেছে। ধর্ম্মরাজ ধ্রুব-সিংহাসন ত্যাগ করিলে উত্তর দিকের এই ক্ষুদ্রতারা ধ্রুব-সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল। মহাভারতে এই ক্ষুদ্র ধ্রুব-তারা উত্তরাপুত্র পরীক্ষিৎ নাম পাইয়াছে।

রাহুসর্প অশ্বত্থামা তারালাঙ্গল বা ঈষিকা অস্ত্রক্ষেপে এই পরীক্ষিৎকে গর্ভে বিনাশ করিয়াছিল। ধ্রুবচক্র বা সুদর্শনচক্র উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়া গর্ভস্থ শিশুকে পুনর্জীবন দান করিল। পরীক্ষিতের ধ্রুবত্ব কালে ঋষি রেখা কর্কট রাশিতে ছিল, তখন যুযুৎসু কর্কট রাশি-চক্রের শীর্ষস্থান অধিকার করিত। এবং দেবভাগের নীলবর্ণ রূপ-তারা বা সোমতারা সর্ব্বোচ্চস্থানে থাকিয়া রাশি-চক্রের নেতা ছিল।

পিতৃপতির পদতলে সপ্তর্ষিমণ্ডল অধিষ্ঠিত আছে। এই সপ্তর্ষিগণ স্বর্গে পিতৃগণ নাম ধারণ করেন। যে মরীচি-আদয়ঃ সপ্ত স্বর্গে তে পিতরঃ স্মৃতাঃ॥ এই তারা মণ্ডল ঋক্‌বেদে "বৃহৎ রথ" এবং বেবিলন নগরে "মাগিড্ডা" (বৃহৎ রথ) উপাধি ধারণ করিত

• যত্র রথস্য বৃহতঃ বিধানম্……।

ঋ ৩।৫৩।৬

এবং মহাভারতে স্বর্গরাজ নহুষের ব্রহ্মর্ষি-বাহিত "শিবিকা" খ্যাতি পাইয়াছে।

ধর্ম্মরাজ তারার দূর অগ্নিকোণে পবন দৈবত স্বাতি নক্ষত্রে মরুৎগণ সতত বিহার করিতেছে।

ধ্রুব চক্র পাশ্চাত্যের Polar circle, তারা শিশুমার পাশ্চাত্যের Little bear, ধ্রুবতারা পাশ্চাত্যের Polaris, ধর্ম্মতারা পাশ্চাত্যের Kocab, ইন্দ্রতারা পাশ্চাত্যের Gamma lersae minoris, কুকুর-লাঙ্গুল গ্রীসদেশের "Ky no su ra" (Dog's Tail), ধর্ম্মরাজ তারা পাশ্চাত্যের Thuban, পরীক্ষিত তারা পাশ্চাত্যের 10 Draconis, বৃহৎ রথ পাশ্চাত্যের Long chariot, স্বাতি নক্ষত্র পাশ্চাত্যের Arcturus, ঋষি-রেখা পাশ্চাত্যের Solsticial Colure, তারা লাঙ্গল পাশ্চাত্যের Sickle, সোম তারা পাশ্চাত্যের Castor.

উপপত্তি

পৃথিবীর সর্ব্বত্র হইতে ধ্রুবতারা পরি-অব-ঈক্ষিত হইয়া থাকে। পরি-ঈক্ষিত তারা ধ্রুবচক্রের একটী ক্ষুদ্র তারা। ধর্ম্মরাজ তারা

ধ্রুবসিংহাসন ত্যাগ করিলে পরি-ঈক্ষিত তারা ধ্রুবসিংহাসন আরোহণ করিলেন।

পরীক্ষিত তারার ধ্রুবত্ব আসলে তারা কর্কট রাশিচক্রের শীর্ষস্থানে ছিল এবং তারা-জগতের নেতা ছিল। তাই যুযুৎসুর হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত হইল। এবং কৃপ বালক পরীক্ষিতের গুরু ও চালক হইলেন। পরীক্ষিত ধ্রবতারা সতত উত্তরার (উত্তরদিক) ক্রোড়ে আসীন আছে।

পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া গ্রহগণ রাশিচক্রে বিচরণ করে। পাণ্ডবগণ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া স্বর্গে চলিলেন।

বাসন্তিক দ্বারে অগ্নির নাক্ষত্রিক প্রতিমা "পথঃ পতি" পূষনদেব তাহাদিগের পথ ছাড়িয়া দিলেন। এবং জল বিষুপ দ্বারে অর্থাৎ জলমগ্ন দ্বারিকায় উপনীত হইয়া তাহারা পিতৃযান বাহিয়া উত্তর অভিমুখে স্বর্গে চলিলেন। পুরাণে বর্ণিত গঙ্গার অবতরণ এবং অবেস্তায় বর্ণিত "অদ্বিপুর অনহিত"এর অবতরণ অনুলোম-গতি এবং মহাভারতে বর্ণিত স্বর্গের পথ বিলোম-গতি তুলনা কর। "সুমেরু হইতে দেবরথ স্বর্গে উত্থিত হইতে লাগিল" এবং বিষ্ণুপুরাণ মতে (২।৮।১০৬) গঙ্গা—মেরুপৃষ্ঠে পততি উচ্চৈঃ নিষ্ক্রান্তা শশিমণ্ডলাৎ।" কুকুর লাঙ্গুল সহচর ধর্ম্মরাজ তারা পরম পদে বিরাজ করে এবং গ্রহগণ রাশিচক্রে বিচরণ করে; ফলে, ভীমাদির পতন হইল। কুকুর-সহচর যুধিষ্ঠির স্বর্গে উঠিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র, দেবরথ, ধর্ম্ম, কুকুর লাঙ্গুল মরুৎগণ ও ধর্ম্মরাজ সকলকেই আমরা পরম পদে সমবেত দেখিতেছি। এবং "কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিয়া পাণ্ডবগণের কীর্ত্তি বিস্তার করতঃ মহাভারত রচনা করিয়াছেন" ইহাও আমরা জানিতেছি।

সুতরাং মহাপ্রস্থান রচনাকালে সেই মহাকবির চিত্তপটে পরম পদের চিত্র চিত্রিত ছিল না, এ কথা বলিতে গেলে অতি বিষম সাহসিকতার আশ্রয় লইতে হয়।

এই দিব্য দৃষ্টি কেবল মহাকবির নিজের ছিল তাহা নহে। ব্যাসদেব "সঞ্জয়কে দিব্য-চক্ষুসমন্বিত" করিয়াছিলেন। ভাগীরথী-তীরে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে "দিব্যচক্ষু" প্রদান করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের মৃতবীরগণ ভাগীরথীর সলিল হইতে উত্থিত হইলে সেই দিব্যচক্ষুর বলে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র এবং বদ্ধনেত্র গান্ধারী আদি দুর্য্যোধন কর্ণ আদিকে দর্শন করিলেন।

নৈয়ায়িক ভারতে দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে রচিত গ্রন্থ ইতিবৃত্ত (history) বলিয়া পরি-গৃহীত হইতে পারে। কারিকরের নৈপুণ্য অথবা প্রাচ্যের বিশ্বাসের গভীরতা এ দু'য়ের কাহাকে বাহবা দেই ?

তারাদর্শক।

বেহার-চিত্র

রামপিয়ারীর বিবাহ

(বেহারের বিবাহ-রীতি)

পিতা বাঁকে করিয়া বাড়ী বাড়ী দুগ্ধ ও ঘৃত বিক্রয় করিয়া বেড়াইত, কিন্তু পুত্রের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। রূপচাঁদ গোয়ালার পুত্র রাসোবাবু রাসবিহারী মণ্ডলে পরিণত হইয়াছিল। রাসবিহারী বাল্যকালে সহরে থাকিয়া মুঙ্গের জেলা স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। সুতরাং এরূপ ইংরাজী শিক্ষিত পুত্রের পক্ষে পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করা সম্ভব ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর সেইজন্য সভ্য রাসবিহারী পৈতৃক গরু-বাছুর বেচিয়া ঠিকাদারির কাজ লইয়াছিল।

রাসবিহারীর নূতন উদ্যম নিষ্ফল হয় নাই। চঞ্চলা কমলা ইঁটকাঠের কঠিন বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছিলেন। রাসবিহারী ঠিকাদারি করিয়া দশহাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল।

রাসবিহারীর একটী অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা রামপিয়ারী এবং একটী পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র বিরঞ্চিলাল। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারীর মতি-গতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। রাসবিহারী তাহার আদরের কন্যাকে কোন দুগ্ধবাহীর পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিবার কল্পনাকেও সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সুতরাং পিসিমাতা বয়স্কা কন্যার এ পর্য্যন্ত বিবাহ না দেওয়ার জন্য রাসবিহারীর লাঞ্ছনার অবধি না রাখিলেও সে নীরবে সমস্ত সহ্য করিয়া ব্যাকুল ভাবে উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিতেছিল।

বহু অন্বেষণের পর রাসবিহারীর রহিমপুরের বাবুদের প্রতি দৃষ্টি পড়িল।

রহিমপুরের বাবু গিরবরধারী আকণ্ঠ ঋণমগ্ন হইলেও একজন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত জমিদার। তাঁহার পুত্র সিংহেশ্বরও চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সেই ভাগলপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়িতেছিল। সুতরাং সর্ব্বাংশে এরূপ সুপাত্র মেলা দুর্ঘট। রাসবিহারী সংকল্প করিল, কন্যার জন্য কোন প্রকারে এই পাত্ররত্নকে সংগ্রহ করিতেই হইবে।

হৃদয়ে দৃঢ়সংকল্প বহিয়া সে সে-অঞ্চলের বিখ্যাত ঘটক গুণেশ্বর শর্ম্মার শরণাপন্ন হইল। সমস্ত শুনিয়া গুণেশ্বর রাসবিহারীকে আশ্বাস দিয়া বলিল যে, গুণেশ্বর থাকিতে যদি এই শুভকার্য্য সুসিদ্ধ না হয় তাহা হইলে বৃথাই সে ঘটকালি করিয়া "মোচ" পাকাইয়াছে! আশ্বস্ত রাসবিহারী ঘরে ফিরিয়া আসিল। গুণেশ্বর পরদিন প্রত্যুষেই ললাটে শ্বেত রক্ত পীত নানাবর্ণের বিচিত্র তিলক কাটিয়া মস্তকে শুভ্র উষ্ণীষটী সযত্নে বাঁধিয়া আরক্ত মের্জাইএর উপর বাসন্তী বর্ণের উত্তরীয় দোলাইয়া এলাচি হস্তে দ্রুতবেগে গিরবরধারীর সভাভিমুখে ধাবমান হইল।

বাবু গিরবরধারী তখন মসী-মলিন ফরাসে ছিন্ন তাকিয়ার উপর গুরুভার দেহ রক্ষা করিয়া বিশাল উদর সম্পূর্ণ অনাবৃত করিয়া চশমাচক্ষে হিসাবের কাগজ-পত্র দেখিতে-

ছিলেন। সম্মুখে পাটোয়ারী ফিরঙ্গিলাল গরুড়ের মত করজোড়ে বাবু সাহেবের গোলাকার বদনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়াছিল। পশ্চাতে একটী ক্ষীণকায় ভৃত্য কিঞ্চিৎ সুগন্ধি তৈল লইয়া বাবুজির মস্তকের মধ্যস্থলে ধীরে ধীরে মর্দ্দন করিতেছিল।

ধীরে ধীরে আর একটী ভৃত্য নিজের মলিন ও দুর্গন্ধ গামছায় ঢাকিয়া এক লোটা সদ্য দোহিত দুগ্ধ লইয়া বাবুজির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাবুজি কটাক্ষে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পাটোয়ারির দিকে খাতা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "যাইয়ে যাইয়ে আচ্ছা করকে কাম কিজিয়ে। বহুৎ সব গড়বড় হয়!" চতুর পাটোয়ারি মনে মনে হাসিয়া দীর্ঘ সেলাম করিয়া খাতা লইয়া দূরে সরিয়া গেল। বাবুজি এক নিশ্বাসে এক লোটা দুগ্ধ গলাধঃকরণ করিয়া তৃপ্তিজনক উদ্গার তুলিয়া মুখ ধুইয়া ফেলিলেন।

ঠিক সেই সময়ে সুবিখ্যাত গুণেশ্বর শর্ম্মা হাস্যবিকশিত বদনে দুই হাত তুলিয়া বাবুজিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার হস্তে আশীর্ব্বাদী এলাচি প্রদান করিলেন।

স্থূলোদর গিরবর শিথিল বস্ত্রখণ্ড কোন প্রকারে সংযত করিয়া পণ্ডিতজিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার শুভাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

পণ্ডিতজি বিস্তর রীতিবিশুদ্ধ সৌজন্য প্রদর্শনের পর প্রকৃত বিষয়ের উত্থাপন করিয়া কহিলেন "বাবুজির কনিষ্ঠ পুত্র শুনিতেছি, বিদ্যাবিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছেন। কিন্তু অকলঙ্ক চন্দ্রে একবিন্দু কালিমা রাখিতেছেন কেন?—"

কৌতূহলাক্রান্ত বাবুজি হাসিয়া বলিলেন "কোন্ কথা বলিতেছেন পণ্ডিতজি?"

পণ্ডিতজি তাঁহার সমস্ত জ্ঞানসিন্ধু মথিত করিয়া বাবুজিকে বুঝাইলেন যে, সকল সংস্কারের মধ্যে বিবাহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং এই সংস্কার ব্যতীত মনুষ্যের ক্রিয়া-কর্ম্ম সমস্তই বিফল।

হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ গিরবর এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

পণ্ডিতজি ক্রমশঃ বাবুয়াজির বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন যে, হিন্দুর কুলধর্ম্মানুসারে বাবুয়াজির আর বিবাহ না দেওয়া ভাল দেখায় না। বিশেষতঃ উপযুক্ত পাত্রী যখন নিকটেই রহিয়াছে।

উৎসুক গিরবর বলিলেন "কোন্ পাত্রীর কথা বলিতেছেন?" পণ্ডিতজি চতুর হাসি হাসিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন "কেন? বাবু রাসবিহারী মণ্ডলের নাম শুনেন নাই? তিনি যে আজ বিধাতার কৃপায় লক্ষপতি!"

কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া গিরবর বলিলেন "কোন্ রাসবিহারীর কথা বলিতেছেন পণ্ডিতজি? কল্যাণপুরের রূপচাঁদের পুত্র রাসবিহারী? তার অবস্থা কি ভাল?" পণ্ডিতজি বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিলেন। "বলেন কি? রাসবিহারী বাবু আজকাল জেলার মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ধনী! বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা যখন তখন বাহির করিয়া দিতে পারেন!"

বিস্মিত হইয়া গিরিবর বলিলেন "বলেন কি পণ্ডিতজি? রাসবিহারী লাখ টাকা

করিয়াছে ?" পণ্ডিতজি গম্ভীর হইয়া বলিলেন "লাখ টাকা ত বটেই। তবে কত লাখ, আমি গরিব মানুষ, ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।"

গিরবরধারী সম্প্রতি পাওনাদারদের তাড়নায় কিছু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্বন্ধটা তাঁহার নিতান্ত মন্দ মনে হইল না।

আভাসে মনের ভাব বুঝিয়া ঘটকচূড়ামণি রাসবিহারীর ঐশ্বর্য্য, আড়ম্বর ও বদান্যতা সম্বন্ধে কোন অসম্ভব গল্পই অবশিষ্ট রাখিলেন না।

গিরবর পণ্ডিতজির আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য দেওয়ানজিকে আদেশ করিলেন।

সেই দিনই অপরাহ্ণে আচার্য্য ও পুরোহিত মহাশয়ের সাহায্যে সম্বন্ধ পাকা করিবার জন্য "ধানবট্টির" দিন স্থির হইয়া গেল।

(২)

পুরোহিত আসিয়া শুভক্ষণ নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। যথাসময়ে রাসবিহারী বহুমূল্য সজ্জায় ভূষিত হইয়া কপালে দধি ও হরিদ্রার তিলক কাটিয়া পুরোহিত ঠাকুর ও গুণেশ্বর শর্ম্মাকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অন্তঃপুরে নারীকণ্ঠে সঙ্গীতলহরী গুঞ্জরিয়া উঠিল। দাসী ও দরিদ্রশ্রেণীর প্রতিবেশিনীরা হস্তীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তারস্বরে গান ধরিল। রাসবিহারী 'ধানবট্টির" উদ্দেশ্যে রহিমপুর যাত্রা করিলেন। পুরোহিত অনুগামী নাপিতকে একসের ধান্য যত্ন করিয়া উত্তরীয়ে বাঁধিয়া লইতে বলিলেন।

ইতিপূর্ব্বেই রহিমপুরে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল। গিরিবরধারীর মলিন ফরাস আজ শুভ্র আস্তরণে আবৃত হইয়াছিল। চারিদিকে বিপুলদেহ তাকিয়া সজ্জিত হইয়াছিল।

মধ্যস্থলে বিচিত্রবর্ণপরিচ্ছদ-পরিহিত গিরিবরধারী তাহাদের মধ্যে স্থূলতম ও বিচিত্রতম তাকিয়ারূপে শোভা পাইতেছিলেন। সম্মুখে রূপার থালে পান ও এলাচি স্তূপাকারে রক্ষিত হইয়াছিল,—পার্শ্বে রূপার আতরদান ও গোলাপদান শোভা পাইতেছিল এবং নিকটে রজতশৃঙ্খলখচিত বৃহৎ আলবোলার মস্তক হইতে সুরভি তাম্রকূট-ধূম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

রাসবিহারীর সুসজ্জিত হস্তী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। বরপক্ষের পুরোহিত ছুটিয়া আসিয়া বাবুসাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সুখাসীন গিরিবর আপনার বিশাল বপু আন্দোলিত করিয়া অতিথিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সাগ্রহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ভদ্রোচিত শিষ্টাচার বিনিময়ের পর বিবাহের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। বরপক্ষের পুরোহিত দীর্ঘ মুখবন্ধ করিয়া বলিলেন "আমাদের বাবুয়াজির মত ছেলে আপনার সমস্ত মুঙ্গের জেলা খুঁজিয়া পাইবেন না। যেমন বিদ্যাবুদ্ধি, তেমনি ব্রাহ্মণ-সজ্জনে ভক্তি, তেমনি শিষ্টাচার—দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। বাবু সাহেবের এখন পুত্রের বিবাহ দিবার তাদৃশ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আপনার মত কুটুম্ব ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নয় বলিয়াই আমরা বহু কষ্টে তাঁহাকে সম্মত করিয়াছি। এখন পাত্রের উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিলেই সকলদিক রক্ষা হয়। অবশ্য আপনি "আমীর"

লোক, আপনাকে এ সকল কথা বলাই বাহুল্য। বরের "তিলক" (বর-পণ) যাহাতে আপনার নাম ও যশের অনুরূপ হয় তাহাই বাঞ্ছনীয়।"

গুণেশ্বর হাসিয়া বলিলেন "সূর্য্যকে আলো দিবার জন্য অনুরোধ করিতে হয় না। সূর্য্য উদিত হইলে আপনিই চারিদিকে আলোক-রাশি ছড়াইয়া পড়ে। রাসবিহারী বাবুকে দিবার কথা বলা বাহুল্য মাত্র। দানই তাঁহার জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। "তিলক" যাহা পাইবেন তাহাতে আপনারা "খুস্" হইয়া যাইবেন।"

উচ্চ হাস্য করিয়া গিরিবর বলিলেন "বিলক্ষণ। সে কথা কি আর উঁহাকে বলিতে হইবে ?"

অনেক ভব্যতাযুক্ত উত্তর-প্রত্যুত্তরের পর "তিলকের" পরিমাণ দুই হাজার টাকা নির্দ্ধারিত হইল। গুণেশ্বর হাসিয়া বলিলেন "রাসবিহারী বাবুর পক্ষে দুই হাজার টাকা দুইখানা ইষ্টকখণ্ড মাত্র, সেজন্য আপনাদের কোন চিন্তা নাই।"

লক্ষপতি-রূপে পরিচিত রাসবিহারী গুণেশ্বরের কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না।

তখন পঞ্জিকা লইয়া "লগন" স্থির করার ধুম পড়িয়া গেল।

বরকন্যার "টিপন" (কোষ্ঠী) বিচার ইতি-পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছিল। আচার্য্য গভীর গবেষণা করিয়া বলিয়াছিলেন "রাশ বরগ বৈঠ্ গেল্।" সুতরাং এক্ষণে দিনস্থির হইলেই হয়। উভয় পক্ষের পুরোহিতের তুমুল বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে ২২শে বৈশাখই প্রকৃষ্ট দিন।

রাসবিহারীর পুরোহিত বলিলেন "তাহা হইলে আর কেন ? 'ধানবট্টি'টা হইয়া যাক।" পুরোহিতের ইঙ্গিতে নাপিত একটী পাত্রে গৃহ হইতে আনীত ধান্য রক্ষা করিল। বরপক্ষের নাপিতও অন্তঃপুর হইতে কিছু ধান্য লইয়া আসিল।

পুরোহিত উভয় ধান্য মিলাইয়া অর্দ্ধেক বরকর্ত্তা এবং অর্দ্ধেক কন্যাকর্ত্তাকে বিভক্ত করিয়া দিলেন। উভয়েই নিজ নিজ উত্তরীয় মধ্যে ধান্য গ্রহণ করিয়া পুরোহিতকে প্রণাম করিলেন। অন্তঃপুরে মঙ্গলসঙ্গীত মুখরিত হইয়া উঠিল। বাদ্যকর বাঁশিতে আনন্দের তান ধরিল।

যথাসময়ে রাসবিহারী ধানবট্টির ধান লইয়া গৃহে ফিরিলেন। অন্তঃপুরে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। রামপিয়ারী অঙ্গন মধ্যে আনীত হইল। পাঁচজন "এয়ো" মিলিয়া তাহার "চুমৌনা" সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে কয়েকবাটী চাউল লইয়া এয়োরা একে একে গান করিতে করিতে কন্যার পায়ে, হাঁটুতে ও কাঁধে ছোঁয়াইয়া ছোঁয়াইয়া চাউলগুলি তাহার মাথায় ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন।

রাসবিহারীর পিসি আসিয়া রামপিয়ারীর চিবুক ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিলেন :—

"সোণেমে সোহাগা সুইমে তাগা
দুল্হিন বান্দ মন দুল্হা সে লাগা।"

(যেমন সোণার সঙ্গে সোহাগার, সূচের সঙ্গে সূতার, তেমনি বরের মনের সঙ্গে কন্যার মন যুক্ত হইয়া গেল)।

"দুর হো" বলিয়া লজ্জিতা রামপিয়ারী ছুটিয়া কক্ষমধ্যে পলাইয়া গেল।

৩

শুভবিবাহের আর অষ্টাহমাত্র বাকি। প্রতিবেশিনী যুবতীরা বেচারা রামপিয়ারীকে একেবারে পাইয়া বসিয়াছিল। কেহ তাহার মাথায় মোম ও মেথির জল দিয়া চিরস্থায়ী বেণীরচনার চেষ্টা করিতেছিল, কেহ তৈল ও হরিদ্রা মাখাইয়া মাখাইয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল এবং কেহ বা গহনা পরাইবার ছলে তাহার প্রাণান্ত করিবার উপক্রম করিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতে, চীৎকারে, হাস্যে, সমস্ত গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল।

রাসবিহারীর পিসি ঘরের এক কোণে একখানি ছোট খাটিয়ায় বসিয়া নীরবে পিতলের বাঁধা হুঁকার তামাকু সেবন করিতেছিলেন। যুবতীদের ভীষণ কোলাহল ক্রমশঃ তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল।

পিসি ক্ষণকালের জন্য হুঁকা হইতে মুখ সরাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন:—"তোরা দিনরাত কেবল রঙ্গরস লইয়াই আছিস। কাজের সঙ্গে কাহারো খোঁজ নাই! বিবাহের আর আটদিন মাত্র বাকি। "আঠমঙ্গরার" (অষ্টমঙ্গলা) কাজকর্ম্ম যে কবে হইবে তার ঠিকানা নাই! কবেই বা "মাট কোড়োয়া" (মাটি খোঁড়া) হইবে, আর কবেই বা "মাড়োয়া" (বিবাহমণ্ডপ) সাজান হইবে, আর কবেই বা কন্যার "উবটন" (গাত্র-হরিদ্রা) হইবে, তাহার কিছুই হুঁস নাই! কেবল হাসি—আর হাসি! আমাদেরও একদিন "জোয়ানি" (যৌবন) ছিল, কিন্তু এত বাড়াবাড়ি ত কখন করি নাই! বুড়ীদের খেটে খেটে "জান" গেল আর ছুঁড়ীদের কেবল রঙ্গরস!"

একজন স্পষ্টভাষিণী যুবতী অস্ফুটস্বরে বলিয়া ফেলিল "খাটুনি বই কি! খাটিয়ায় বসিয়া বসিয়া দিনরাত্রি তামাকের ধুঁয়াটানা কি কম খাটুনি"

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যুবতীর অস্ফুটস্বর বৃদ্ধার কাণে পৌঁছিল। বৃদ্ধা তীব্র হুঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠিলেন:—

"দেখনে মে তন্বি—
লীলা মে ধন্নি!"

(দেখিতে এতটুকু কিন্তু লীলায় ধন্য)!

যুবতীরা যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পলাইল। বিপন্ন রামপিয়ারী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

রামপিয়ারীর মা পথ হইতে যুবতীদের ফিরাইয়া আনিয়া বলিলেন "চল্ মাটকোড়োয়া করিয়া আসি।" তখন সুসজ্জিত যুবতীবৃন্দ দল বাঁধিয়া গান করিতে করিতে মাটি আনিতে চলিল। গ্রামপ্রান্তস্থ ইঁদারার পার্শ্বে ইতিপূর্ব্বেই রক্তমৃত্তিকালিপ্ত বেদি রচিত হইয়াছিল। যুবতীরা গান গাহিতে গাহিতে সেখানে আসিয়া বেদি হইতে একতাল মৃত্তিকা তুলিয়া লইল। মৃত্তিকা একজনের মস্তকে স্থাপিত হইল। গান গাইতে গাইতে সকলে মৃত্তিকা লইয়া অঙ্গন মধ্যে সদ্যপ্রোথিত কদলী ও বংশদণ্ডের নিম্নে স্থাপন করিল। তার পর সকলে মিলিয়া গান করিতে করিতে সেই মৃত্তিকা দিয়া তথায় চুল্লী প্রস্তুত করিল।

সহসা অন্তঃপুর গৃহদ্বারে তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। রাসবিহারীর পিসির "কাংস্য ক্রেঙ্কার" সকলের গলা ছাড়িয়া উঠিল।

ব্যাপার কি দেখিবার জন্য রামপিয়ারীর

মাতা ছুটিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। যুবতীরাও তাঁহার অনুগমন করিল।

পিসিমাতা তখন একজন স্ত্রীলোকের চুলের মুঠি ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন! রামপিয়ারীর মাকে দেখিয়াপিসি গর্জ্জিয়া উঠিলেন :—

"নিচিন্ত শুতে কুম্‌হৈনি
মাট্টি না লে যায় চোর!"

(কুম্ভকার পত্নী নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যায়, কারণ সে জানে যে চোরে মাটি লইয়া যায় না।)

পিসিমার তর্জ্জন-গর্জ্জন ও কোলাহলের মধ্য হইতে অনেক কষ্টে বুঝা গেল যে, পিসিমাতা কর্ত্তৃক ধৃতকেশা অভাগিনী বরপক্ষীয়া নাপিতানী—লুকাইয়া কন্যা দেখিতে আসিয়াছিল! একটু অবকাশ পাইয়া নাপিতানী বলিল "আপনাদের ত আর কালো-কুৎসিৎ মেয়ে নয়। এমন সুন্দর মেয়ে—দেখিলেই বা ক্ষতি কি?"

পিসি গর্জ্জিয়া উঠিলেন "কি; তোর জন্য চিরকালের কুলরীতি বদলাইতে হইবে?" রামপিয়ারীর মাতা অগ্রসর হইয়া বলিলেন "মরুক, ওরা কি অত রীতিনীতি জানে? যাও বাছা, কাজটা কিন্তু ভাল কর নাই। আমাদের জাতে বিবাহের আগে কন্যা দেখিতে নাই!"

নাপিতানী অবসর পাইয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। পিসিমা গর্জ্জিতে লাগিলেন "যত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড! কালে কালে ধর্ম্ম-কর্ম্ম আর কিছুই রহিল না!"

(৪)

বিবাহের আর একদিন মাত্র দেরি। অঙ্গন মধ্যে পূর্ব্বস্থাপিত চুল্লীর উপরে বংশনির্ম্মিত—"মাড়োয়া" (মণ্ডপ) নির্ম্মিত হইয়াছিল। মাড়োয়ার মধ্যস্থলে মৃত্তিকা মধ্যে "হরিস্" (হল) "পালো" (জোয়াল) এবং কঞ্চি প্রোথিত হইয়াছিল।

কুম্ভকার আসিয়া মণ্ডপ মধ্যে "কল্‌সা" (কলস) এবং "চৌমুখ" (চতুর্ম্মুখ দীপাধার) রাখিয়া গেল। রাসবিহারীর পিসি আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "আঃ! এদের নিয়ে আর পারা গেল না! রাসোই বা গেল কোথায়, আর বৌই বা গেল কোথায়? কখনই বা "ঘিউঢারি" হবে, আর কখনই বা "মন্ত্রিপুজা" হবে? বেলা ত দ্বিপ্রহর হ'ল!"

পিসির গর্জ্জন শুনিয়া রাসবিহারী তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিলেন "কি পিসি, এত চেঁচামেচি করচ কেন? এই ত আমরা এখানেই আছি।"

ক্রুদ্ধা পিসি হাত নাড়িয়া সুর করিয়া বলিলেন :—

বৌয়া চলল্ বাসকে।
জোল্‌হা চলল্ ঘাসকে॥

(যখন কাকের বাসায় ফিরিবার সময় হইল, তখন তাঁতী ঘাস বাটীতে বাহির হইলেন!)

রাসবিহারী হাসিয়া বলিলেন "সন্ধ্যার এখনো অনেক দেরি। তুমি কিছু ভেবো না পিসি। সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

সদ্যস্নাত পুরোহিত মস্তকে পুষ্পখচিত দীর্ঘশিখা এবং স্কন্ধে হরিদ্রাবর্ণ উত্তরীয় দোলাইয়া দ্রুতবেগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাসবিহারী মণ্ডপের বংশদণ্ডে ঘৃতলেপন করিয়া দিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী তাহাতে সিঁদূরের টিপ দিয়া দিলেন।

"ঘিউচারি" হইয়া গেলে পুরোহিত যজমানকে "মন্নিপূজা" (পিতৃশ্রাদ্ধ) করিতে বসাইলেন। ক্ষণমধ্যেই মণ্ডপ ধ্বনিত করিয়া পুরোহিত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল "জম্বুদ্বীপে ভারতখণ্ডে, বৈবস্বত মন্বন্তরে, শ্বেতবরাহ-কল্পে" ইত্যাদি। এদিকে অন্তঃপুরে কন্যার "উবটনের" (গাত্রহরিদ্রার) ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। সুসজ্জিতা যুবতীবৃন্দের কলহাস্য ও সঙ্গীতে সমস্ত অঙ্গন মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল।

প্রথমে পাঁচজন পুরুষ কন্যার কপালে তৈল ও হরিদ্রা লেপন করিয়া তাহার মস্তকে দূর্ব্বা ছিটাইয়া দিয়া গেল। তারপর যুবতীরা তাহাকে লইয়া পড়িল। তৈল-হরিদ্রা ও রঙের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল।

কন্যার আপাদমস্তক তৈল ও হরিদ্রায় মণ্ডিত হইল। যুবতীবৃন্দেরও বস্ত্র বক্ষোবাস ও মুখমণ্ডল হরিদ্রায় ও রঙে রঞ্জিত হইয়া গেল। হাস্যে রহস্যে সঙ্গীতে নৃত্যে অঙ্গন মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

রাসবিহারীর পিসি তাঁহার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ সপ্তমে চড়াইয়াও যুবতীদের নিরস্ত করিতে না পারিয়া হতাশভাবে ঘন ঘন তাম্রকূট সেবনে মনোনিবেশ করিলেন।

৫

আজ বিবাহের দিন। প্রত্যূষ হইতে সানাইয়ের সমুচ্চ স্বরলহরী প্রভাতবায়ু কম্পিত করিতেছিল। দাস-দাসী এবং ছেলেমেয়েরা রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। পুরাঙ্গনাগণের সমাগত সঙ্গীতে অন্তঃপুর প্রাঙ্গন নিনাদিত হইতেছিল। রাসবিহারীর পিসির চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বাহিরে সমাগত কুটুম্বদের অভ্যর্থনার ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। "বেগার" ও চাকরেরা হুকুম পালন করিতে করিতে গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিতেছিল। বরযাত্রিগণের আহারের জন্য রাশি রাশি খাদ্যসম্ভার স্তূপাকারে সজ্জিত হইতেছিল। মুন্সীজি হিসাবের খাতা ও কলম-দোয়াত লইয়া ব্যাকুল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

• নারীকণ্ঠের সঙ্গীত-লহরীর মধ্যে মাড়োয়া-স্থিত চুল্লীর সাহায্যে ধানবাটির ধান ভাজিয়া খই করা হইল।

রামপিয়ারীর মাতুল হরিহর ভগিনী ও ভাগিনেয়ীকে লইয়া মাড়োয়ায় উপস্থিত হইলেন। নাপিতানী অগ্রসর হইয়া মাড়োয়া-স্থিত আম্রপল্লব হইতে একটী পাতা ছিঁড়িয়া তাহার বোঁটাটি হরিহরের হস্তে প্রদান করিল।

হরিহর ভগিনীর বামহস্তে কিছু টাকা দিয়া বোঁটাটি তাহার মুখের কাছে ধরিলেন। রামপিয়ারীর মাতা দাঁত দিয়া বোঁটার কিয়দংশ কাটিয়া লইয়া লইয়া আপনার দক্ষিণ হস্তে রাখিলেন। হরিহর বোঁটার উপর একটু জল ঢালিয়া দিলেন। মাতা জলযুক্ত বোঁটাটি ক্ষণকাল কন্যার মাথার উপর ধরিয়া জলসহ বোঁটাটি মুখে ফেলিয়া গিলিয়া ফেলিলেন। ভ্রাতা ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "জুড়েলু?" (জুড়াইলে?); ভগিনী উত্তর করিলেন "জুড়েলি" (জুড়াইলাম)। "ইমলি ঘোঁটাই" যথাবিধি সম্পন্ন হইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় গ্রামপ্রান্তে বিপুল বাদ্য-ধ্বনি ও তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। চারিদিকে চীৎকার উঠিল "বরিয়াত" আসিয়াছে!

কন্যাপক্ষের পুরুষেরা দ্রুতবেগে বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা করিতে ছুটিলেন।

সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বাবু গিরবরধারী সকলের আগে আগে আসিতেছিলেন। কন্যাপক্ষের পুরোহিত অগ্রসর হইয়া দুইহাত তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাসবিহারী ও হরিহর নমস্কার করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। গিরিবর জিজ্ঞাসা করিলেন—"জনবাসা" (বরযাত্রীদের বাসস্থান) কোথায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? রাসবিহারী বলিলেন "গ্রামের পূর্ব্বদিকে। দুয়ার-লাগির পর সেই পথেই যাওয়া যাইবে।" তখন হস্তী, অশ্ব পাল্কী, ডুলি ও গোযান অধিষ্ঠিত সহস্রাধিক বরযাত্রী তুমুল কোলাহলে রাসবিহারীর অনুগমন করিল।

বরযাত্রীরা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র পথের দুই ধার হইতে অশ্রাব্য গালির তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। লজ্জাশীলা পুরাঙ্গনারা অবগুণ্ঠনে বদনমণ্ডল আবৃত করিয়া বরযাত্রীদের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ গভীর গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে, বাঙ্গালাদেশে বরের হস্তস্থিত জাঁতি পূর্ব্বকালে কন্যাহরণের জন্য ব্যবহৃত তরবারির স্থান অধিকার করিয়াছে। এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বেহারে আক্রমণকারীর প্রতিরোধের জন্য প্রযুক্ত এই সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ যে লৌহবাণের স্থান গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবসর থাকে না; এবং প্রকৃত পক্ষে শত্রুকে বিদীর্ণ করিবার পক্ষে বাক্যবাণ যে লৌহবাণ অপেক্ষা অল্প উপযোগী এ কথা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কখনই স্বীকার করিতে সম্মত হইবেন না।

কিন্তু "বিবাহে চ ব্যতিক্রমঃ।" এ স্থলে রমণীগণের ন্যায় প্রয়োগপটু যোদ্ধাকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়াও এই তীক্ষ্ণ শর সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল! বরযাত্রিগণ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তীতুমিরের মত সমস্ত গালি অম্লান বদনে পরিপাক করিয়া হৃষ্টচিত্তে অভীষ্টপথে অগ্রসর হইল।

বর কন্যার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র যুবতীবৃন্দ তাহার প্রতি আতপ, গোবর এবং ভাতের লাড়ু নিক্ষেপ করিয়া তাহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। একজন সধবা অগ্রসর হইয়া থালের উপর প্রদীপ রাখিয়া থালাখানি বরের হাতে দিয়া নিজের "চুনরি" (অঞ্চল) প্রদীপের উপর তাতাইয়া তাতাইয়া একবার বরের কপালে এবং একবার নিজের কপালে ছোঁয়াইয়া ছোঁয়াইয়া বরের বরণ করিলেন। "পরছাওন" (বরণ) সমাপ্ত হইলে কন্যার মাতা একটী নোড়া লইয়া নিজের হাতে ধরিয়া ধরিয়া বরের গালে ঠেকাইয়া তাহার "গালে সেঁকি" করিয়া দিলেন।

ইহার পর কন্যার পিতা আসিয়া বরের কপালে চন্দনের তিলক পরাইয়া দিলেন। 'দুয়ার লাগি' সমাপ্ত হইল। বিপুল 'বরিয়াত' আবার প্রচণ্ড গালিবর্ষণের মধ্য দিয়া মন্থরগতিতে 'জনবাসার' দিকে অগ্রসর হইল।

(৬)

গ্রাম-প্রান্তস্থ বৃহৎ আম্রকাননে 'জনবাসার' স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বরযাত্রিগণের বাসের আয়োজনের মধ্যে

দুই একটী ছেঁড়া তাঁবু এবং কয়েকখানি সতরঞ্চি;—উপরে আম্রবৃক্ষছায়া এবং নিম্নে তৃণক্ষেত্র-শোভিত স্বভাবের অবারিত কক্ষ।

বরযাত্রীরা উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ ভৃত্য পাচকাদির সাহায্যে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। দুইজন কোকিল-কৃষ্ণ বর্ণ অস্থিসার বাইজি বরযাত্রিগণের আনন্দ-বিধানের জন্য সদলবলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বরকর্ত্তাকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে আপনাদের আসরের স্থান করিয়া লইল। সারেঙ্গীরা মাথা মুখ নাড়িয়া সারেঙ্গে সুর বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল।

হাসিতে হাসিতে রামপিয়ারীর সম্পর্কে ভগিনীপতি গঙ্গাধর একটী বৃহৎ বাটী হস্তে ধীরে ধীরে জনবাসায় প্রবেশ করিল। গঙ্গাধরের বাটীতে কলাইয়ের বেসম ও লঙ্কাচূর্ণ।

তাহাকে দেখিয়াই বরযাত্রীরা সভয়ে নিজ নিজ নাসিকা বস্ত্রাবৃত করিল। কিন্তু তাহাতেও ফল হইল না। গঙ্গাধর হাসিতে হাসিতে সেই চূর্ণ চারিদিকে উড়াইয়া 'কুকুয়া উড়াই' করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে নানাপ্রকারের হাসির তুমুল কলরবে সমস্ত জনবাস মুখরিত হইয়া উঠিল। স্থূলোদর গিরিবর হাঁচিতে হাঁচিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

যখন অবিরাম হাঁচির দারুণ পরিশ্রমে সকলেই বিপন্ন হইয়া পড়িল, তখন গঙ্গাধর দয়াপরবশ হইয়া বরযাত্রীদের মধ্যে সরবৎ-বিতরণের আদেশ দিল।

সরবৎপান করিয়া প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর যুবক বরযাত্রীদের দৃষ্টি বাইজিদের উপর পড়িল। সকলে আগ্রহ সহকারে তাহাদের ডাকিয়া সভার মধ্যস্থলে বসাইল।

সারঙ্গীরা আবার মন দিয়া সারঙ্গ বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। বাইজিরা তাম্বুলরঞ্জিত ওষ্ঠপুট ঈষৎ স্ফুরিত করিয়া পতঙ্গবৃত্তি পুরুষ-বর্গের প্রতি একবার অগ্নিময় কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন।

এমন সময়ে অরসিক রাসবিহারী আসিয়া জাঁনাইল যে, বিবাহের সমস্তই প্রস্তুত, এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া বরযাত্রিরা শুভাগমন করিলেই হয়। জনবিবাসে ভীষণ কোলাহল পড়িয়া গেল। বরযাত্রীগণের হাঁকাহাঁকি, ভৃত্যবর্গের ছুটাছুটি, গিরিবরধারীর হুঙ্কার, দেওয়ানজি ও তহসিলদার সাহেবের বিকট চিৎকার—সকলে মিলিয়া আম্রকানন ধ্বনিত করিয়া তুলিল।

একঘণ্টাকাল কোলাহল, চীৎকার ও গালিগালাজের পরে বরযাত্রীরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। আবার তুমুল নিনাদে ঢোল-কাঁসি-সানাই বাজিয়া উঠিল। কেরোসিনসিক্ত ঘুঁটে নিবিড় ধূমের সঙ্গে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করিল। হস্তী ঘোটক শিবিকা সুসজ্জিত হইয়া সারি দিয়া দাঁড়াইল।

গিরিবরধারী দেওয়ানজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বিহৌতি' (কন্যার বিবাহের সাড়ী) প্রভৃতি লওয়া হইয়াছে কি না এবং লৌয়া (নাপিত) বরের ও কন্যার 'মার' ও 'পাতমৌর' কন্যার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছে কি না?

যথাযথ উত্তর পাইয়া বরকর্ত্তা 'রামজি' স্মরণ করিয়া হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

বরযাত্রা মন্থর-গতিতে কন্যার গৃহের দিকে অগ্রসর হইল। বরযাত্রীরা বিবাহমণ্ডপে উপবিষ্ট হইলে কন্যা তাঁহাদের সম্মুখে আনীত হইল। বরকর্ত্তা এই সর্ব্বপ্রথম কন্যা 'নিরিনচ্ছণ' করিলেন। রামপিয়ারী দেখিতে তেমন সুন্দরী না হইলেও তাহার—'টিকলি', 'ছুছি', 'বেসর', 'করণফুল', 'ঝুমক', 'কনৌসি', 'চন্দরহার', 'সতলরি', 'হাঁসুলি', 'তাবিজ', 'লাল্‌রি', 'বাজু', 'বাঁকা', 'কঁকনা', 'চুরি', 'পঁহুচি', 'বালা', 'অঁগুঠি', 'কমরকস্', 'পৈরি', 'পৈজনি', 'বটুরি'—প্রভৃতির দ্বারা আপাদমস্তক-পীড়িত দেহযষ্টি বিষয়ী শ্বশুরের চোখে নিতান্ত মন্দ দেখাইল না।

পুরোহিত বর এবং বরযাত্রী যুবকদের দিকে চাহিয়া বলিলেন "কে কে 'অঠৌগঁর' করিতে আসিবেন আসুন না! লগনের আর ত বিলম্ব নাই।"

অনেক রঙ্গরহস্যের পর বরের সঙ্গে বরের সাতজন বন্ধু উঠিয়া দাঁড়াইল।

'উথড়ি' ও 'সামাট' আনীত হইল। বর ও তাহার বন্ধুরা হাসিতে হাসিতে ধান কুটিতে প্রবৃত্ত হইল।

ধানকোটা শেষ হইলে পুরোহিত উথড়ি হইতে কতকগুলি চাউল তুলিয়া লইয়া আম্রপত্র মধ্যে রাখিয়া তাহা দিয়া দুইটী কঙ্কণ প্রস্তুত করিলেন। একটী কঙ্কণ বরের দক্ষিণ হস্তে এবং অপরটী কন্যার বামহস্তে পরাইয়া দেওয়া হইল।

তখন 'কনিয়া বন্দনে'র জন্য বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামেশ্বরের জন্য হাঁকাহাঁকি পড়িয়া গেল। রামেশ্বর উপস্থিত হইলে গিন্নিবন্ন ক্রোধে উদরদেশ ঘন ঘন কম্পিত করিয়া বলিলেন "তোমাদের কোন বিষয়েই হুঁস নাই! কাজের সময় যে কোথায় থাক তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। 'বন্দনে'র জিনিষ-পত্র সব কোথায়?"

দেওয়ানজি নাপিতের নিকট হইতে লইয়া জিনিষ-পত্র সম্মুখে রাখিলেন। রামেশ্বর কন্যার হস্তে মিষ্টান্ন ও অলঙ্কার দিয়া বামহস্ত কন্যার মস্তকের পশ্চাতে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে দধি ও পান লইয়া তাহার কপালে স্পর্শ করাইয়া করাইয়া কন্যা বন্দনা করিল।

এইবার কন্যার জননী বরের নাপিত কর্তৃক আনীত বরের টোপর মাথায় দিয়া মণ্ডপে আসিয়া বসিলেন। কন্যাও 'পাতমৌর' মাথায় দিয়া তাঁহার ক্রোড়ে বসিল। তখন নাপিতানী কন্যা ও কন্যার মাতা উভয়কে কামাইয়া (নখছু) দিল। কন্যা অতঃপর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া 'পি-অরি' (বিবাহের পীতবর্ণ সাড়ী) পরিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

বরযাত্রীরা বরকে রাখিয়া সকলে জনবাসে ফিরিয়া আসিলেন।

এতক্ষণে সুযোগ পাইয়া বাইজিরা বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীসহকারে গাইয়া উঠিল:—

"পরদেশী সাঁইয়া মেরা"—ইত্যাদি।

দুই চারিজন সুসভ্য বরযাত্রী ইতিমধ্যেই গোপনে আনীত বিলাতি মদ্যের কিছু কিছু পান করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের চীৎকার ও প্রশংসা-ধ্বনিতে সমস্ত জনবাস মুখরিত হইয়া উঠিল।

কন্যা 'পি-অরি' পরিয়া বাহিরে আসিলে বরের ডাক পড়িল।

বর মাড়োয়ায় উপবেশন করিলে কন্যার পিতা কন্যাকে বরের বামপার্শ্বে বসাইয়া দিলেন। একজন পুরমহিলা কন্যার মাতার নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়া বরের মাথায় 'মৌর' পরাইয়া দিল। পুরোহিত 'সুমঙ্গলী' (বিবাহমন্ত্র) পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অবশেষে রাসবিহারী হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া শাঁখের মধ্যে জল, ফুল, 'অক্ষত' (আতপ) এবং যৎকিঞ্চিৎ 'কাঞ্চনমূল্য' রাখিয়া সাতবার 'চৌমুখে'র নিকট শঙ্খস্থিত উপহার ঢালিয়া 'কনেয়াদান' সমাপ্ত করিলেন।

কনেয়াদানের পর পুরোহিত বর-কন্যার উত্তরীয় ও অঞ্চল একত্রে বাঁধিয়া 'গেঁঠবন্ধন' করিয়া দিলেন।

তারপর কন্যার হাতে একখানি কুলা দিয়া বরকে কন্যার পশ্চাৎ হইতে সেই কুলা ধরিতে বলিলেন। কন্যার ভ্রাতৃস্থানীয় একটী যুবা ধানবট্টির খই আনিয়া কুলায় ঢালিয়া দিল। বর ও কন্যা সেই খই ছিটাইতে ছিটাইতে পাঁচবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিল।

অগ্নি-প্রদক্ষিণের পর পুরোহিত প্রধূমিত ধূপাধার বরকন্যার সম্মুখে নাড়িয়া নাড়িয়া বর-কন্যার 'আরতি' করিলেন।

সিন্দূরলিপ্তমস্তকা, কজ্জলাঙ্কিতলোচনা, বিচিত্ররেখা বরের শ্যালিকা ও শ্যালকপত্নীরা ধীরে ধীরে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন।

মুহুর্মুহু কর্ণে, গণ্ডে এবং পৃষ্ঠে তাঁহাদের অলঙ্কার-পীড়িত করযুগের সুমধুর স্পর্শ অনুভব করিয়া বেচারা সিংহেশ্বর অচিরে অনুভব করিল যে, যুবতীদের করপদ্মের সঙ্গে প্রকৃত পদ্মের আদৌ সাদৃশ্য নাই এবং বিধাতা তাঁহাদের সুকুমার দেহগুলি প্রকৃতই 'নবনী ছানিয়া' নির্ম্মাণ করেন নাই! তখন 'সেন্দুর দানে'র ধূম পড়িয়া গেল। যুবতীদের কলহাস্য ও সঙ্গীতের মধ্যে বর একখণ্ড গাঁজার সাহায্যে লজ্জামুদিতনয়না কন্যার সীমন্তে সিন্দূর-রেখা টানিয়া দিল।

বিবাহ-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। যুবতীরা ঠেলাঠেলি করিয়া বর ও কন্যাকে গৃহদেবতাকে প্রণাম করাইবার জন্য 'কোহবরে' লইয়া চলিল।

কক্ষের নিকটে লইয়া গিয়া একজন শ্যালিকা বরকে বলিল "আগে একটী মন্ত্র পড়, তবে ত কোহবরে যাইতে পাইবে।"

বর হাসিয়া বলিল "কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইলেই মন্ত্র পড়িতে পারি।" শ্যালিকা দক্ষিণা দান করিলেন। বর মন্ত্র পড়িয়া জুতা খুলিয়া কোহবরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল।

কোহবরের দ্বারের সম্মুখে একজোড়া ছিন্ন পাদুকা পীতবর্ণ বস্ত্রাবৃত হইয়া দেবমহিমায় বিরাজ করিতেছিল। শ্যালিকারা বরকে ধরিয়া বলিল "আগে দুয়ারের দেবতাকে প্রণাম কর তবে ত ভিতরে যাইবে।"

বেচারা প্রণাম করিতেই কলকণ্ঠে হাস্য-লহরী উথলিয়া উঠিল। বেচারা অপ্রস্তুত হইয়া নতমুখে কোহবরে প্রবেশ করিল।

দেবতার পূজা সমাপ্ত হইলে বরকন্যার গ্রন্থিবন্ধন মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

বিবাহ শেষে বর জনবাসে আত্মীয়-স্বজনের নিকট ফিরিয়া আসিল।

রাসবিহারীও সঙ্গে সঙ্গে তথায় উপস্থিত হইয়া, বরযাত্রীদিগকে সপ্তাহকাল গ্রামে অপেক্ষা করিয়া কন্যাকর্ত্তার 'মরজাদ'

রক্ষা করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন।

সদাশয় গিরিবরধারী 'সম্‌ধিকে' (বৈবাহিককে) উপযুক্ত মর্য্যাদাদান করিতে কৃপণতা করিলেন না। তিনি দেওয়ানজিকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন "বরযাত্রীদের আহারাদির জন্য কোন্ কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহার একটা ফিরিস্ত (তালিকা) বৈবাহিক মহাশয়কে দাও।"

দেওয়ানজি চক্ষে চশমা লাগাইয়া ফিরিস্ত প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক বাদানুবাদের পর বরযাত্রীদের দৈনিক আহার্য্যের তালিকা অনেকটা এইরূপ দাঁড়াইল :—

চাউল—১২॥০ মণ
আটা—৩ মণ
ঘৃত—॥০ মণ
খাসি—২০টা
দধি—৩ মণ
মিষ্টান্ন—৩ মণ

এবং আনুষঙ্গিক মশলা, মেওয়া, চিনি, পান ইত্যাদি।

সমাগত হস্তী অশ্ব প্রভৃতির দানাও ফিরিস্ত হইতে বাদ গেল না।

রাসবিহারী ফিরিস্ত লইয়া চলিয়া গেলেন। জনবাসে তাণ্ডব-নৃত্য আরব্ধ হইল।

যাঁহারা ইতিমধ্যে অনেকটা প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা অতঃপর বাইজিদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিকট চীৎকার ও অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিলেন। ব্যাপার দেখিয়া বাইজিরা ধীরে ধীরে একপাশ দিয়া অন্তর্হিত হইল।

যখন রাত্রির আহারাদি সম্পন্ন হইল তখন সূর্য্যোদয়ের আর বড় বিলম্ব নাই।

৮

সপ্তাহের উৎকট কোলাহলের পরে 'রোকসতি'র (বিদায়ের) দিন আসিল।

রাসবিহারীর পরিবারবর্গ বরকর্ত্তার প্রদত্ত সমস্ত উপহার অঙ্গন মধ্যে সাজাইল। সমবেত প্রতিবেশিবৃন্দ বিস্তর গবেষণা করিয়া সমস্ত উপহারের মূল্য পাঁচশত টাকা নির্দ্ধারিত করিলেন। রাসবিহারী বলিলেন "আমি পাঁচশতের স্থানে হাজার টাকার জিনিষ প্রত্যুপহার দিব।"

সকলের প্রশংসার মধ্যে রাসবিহারী বিস্তর বহুমূল্য উপহার লইয়া জনবাস অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। উপহার-সামগ্রী গিরিবরধারীর সম্মুখে সজ্জিত হইল। উপহার দেখিয়া সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। গিরিবর প্রীত হইয়া দেওয়ানজিকে সমস্ত জিনিষপত্র গুছাইয়া লইতে বলিলেন। তাহার পর হাসিতে হাসিতে একখানি নূতন চাদর লইয়া বৈবাহিকের গলায় জড়াইয়া দিলেন। কন্যার পিতা তৎক্ষণাৎ চাদরের মূল্য স্বরূপ পাঁচটী টাকা বৈবাহিকের হস্তে দিয়া "রাম" "রাম" বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। বৈবাহিকও সাদরে তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলেন। বর শাশুড়ীর হস্তে "ক্ষীর ভোজন" করিয়া কন্যার সঙ্গে চতুর্দ্দোলায় উঠিল।

বরযাত্রীর বিপুল বাহিনী তাহাদের অনুগমন করিল।

বরযাত্রের বাজভাণ্ডের আনন্দধ্বনির সঙ্গে

কন্যাগৃহের করুণ রাগিণী মিলিত হইয়া প্রভাতাকাশ কম্পিত করিতে লাগিল।

* * * * *

কন্যাবিরহের শোক কিছু মন্দীভূত হইলে খরচের হিসাবপত্র দেখিয়া রাসবিহারী মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। এই বিবাহ-ব্যাপারে তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত দশ হাজার টাকার সমস্তই প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল।

সুতরাং সপ্তাহকাল পরে যখন বেচারা বৈবাহিকের নিকট হইতে তাহার আতিথ্যের জন্য বিস্তর স্তুতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে অতঃপর সিংহেশ্বরের বিদ্যা-শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহনের জন্য উদার অনুরোধপূর্ণ পত্র পাইল, তখন সে বিশেষ প্রীতি লাভ করিতে পারিল না।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

বাংলায় বৈদেশিক শব্দ

সময়ে সময়ে বাংলার সঙ্গে যে দু'একটী ইংরাজী শব্দ আসিয়া পড়ে ইহা অনেকে পসন্দ করেন না। তাঁহারা ইহাতে কতই বেজার হন। 'লাইন' শব্দটি ব্যবহার করার জন্য এক জন অর্ব্বাচীন লেখককে কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যরথীর প্রতি গালিগালাজ প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু একটু তজ্‌বিজ করিয়া দেখিলেই মালুম হইবে যে, গোসা করিবার কোনই কারণ নাই। দরকার হইলে অন্য ভাষা হইতে শব্দ লইয়া মাতৃভাষার ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার সখ সকলেরই হয়। শত বাধা উৎপন্ন করিলেও এই হাউসের নিবৃত্তি হইবে না। কেননা, গরজ বড় বালাই। আমরা কথায় ও লেখায়, কথায় বেশী লেখায় কম হইলেও বহু বিলাতী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, এ কথা কবুল করিলে ইজ্জতের হানি হইবে না। ইহাতে সরমেরও কোন কারণ নাই। অনেকে হয় তো এই কথা শুনিবামাত্র আস্তীন গুটাইয়া আমার গর্দ্দান লইবার মতলবে অগ্রসর হইবেন। না হয় তো আমাকে ফাটকে আটক রাখিবার জন্য হুকুম জারি করিবেন। আমি তাহাতে ডরাই না। আমি যে তাহাদিগকে নাকাল করিবার জন্য আদালতে যাইয়া উকীল-মোক্তারের তাঁবেদারী করিব, তাহা নহে; কিন্তু অন্য ফিকিরে তাহাদিগের ফন্দী নাখোচ করিব। আপনাদের রায় বাহির হইবার পূর্ব্বেই আমি রায় গুণাকরকে জামিন দিয়া খালাসনামা লিখিয়া লইব। আসল কথা এই, যদিও রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন, বাংলাভাষায় আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের জন্য কেবলমাত্র কতকগুলি শব্দ আছে, এই শব্দগুলির অনেকই যে ধার-করা তাহা একরার করিতে রাজী না হইয়া চারা নাই। আমি আজব কথা বলিতেছি না, ইহা কেহ গুজবও মনে করিবেন না। মুসলমান আমলে এইরূপ বহু শব্দ আমাদের ভাষার সামিল হইয়া গিয়াছে। কোন কোনটা বা একটু বদ্‌লাইয়াছে, কোন কোনটা বা হুবহু যেমনটা ছিল তেমনই রহিয়াছে। এখন কোন্‌টা আসল, কোন্‌টা নকল তাহার ফয়সলা হওয়া

মুস্কিল। এক সময়ে যাহা 'হারবাজুবালা' ছিল, এখন তাহা শরীরের অঙ্গ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহা লইয়া তম্বি করিয়া কোন কিফায়েৎ নাই। কেহ আমাকে এ বদনাম দিতে পারিবেন না যে, আমি খোসামুদি করিতেছি। কেননা, খেতাব বা খেলাৎ মাগি না, মুসলমানের সে একতিয়ার চলিয়া গিয়াছে, বক্‌শিস্‌-ইনামেরও ভরসা নাই। সুতরাং হক কথা মানিয়া লইলে লোকসান কি? তবুও জেদ করিলে আমি নাচার। নেহাৎ জুলুম করিলে ফেরার হব। যা হৌক, কাহারও খাতিরে এ কথা বলি না যে, এই ঋণ অস্বীকার করিয়া আমাদের পোষাক পরিয়া জামা পাজামা আটিয়া বাবু সাজিয়া চাদর উড়াইয়া হাওয়া খাইতে সফরে বাহির হওয়া চলে না। কেবলই কি তাই? জমির আবাদ মখুব রাখিতে হয়, তরমুজের টাল্‌ পাহাল যায়; কোন ফসল তো হয়ই না। আফ্‌শোস করিয়া ফয়দা নাই। জমিদারের সেরেস্তায় তালাস করুন, সদর দরওজায় দেখিবেন জমাদার বরকন্দাজ। তার পর, শিকস্ত পাইকস্ত হইতে সুরু করিয়া মাম্‌লা মোকদ্দমার ভিতর দিয়া খারিজ-দাখিল, দাখিল-খারিজ পর্য্যন্ত খাজানা ও দাখিলা সকলেরই ঐ এক হাল। মহাজনের আবহাল যে ভাল তা নয়। সে বেচারাও আপন দপ্তরে জমাখরচ কর্জ্জ-আদায়, ইজা ইরশাল, ওয়াশীল বাকি, খাস্তা ও বিলাতের হিসাব-নিকাশ লইয়া একেবারে হয়রান্‌ ও জেরবার। তেজারতির আড়তেও আমল পাওয়া দায়। খুচরা ও পাইকারি সব কারবার সমান। দোকানে জায়গা নাই। হেঙ্গামারও শেষ নাই। খরিদ্‌ বিক্রী, আমদানী রপ্তানি; তার উপর, হাল ও বকেয়া মজুত মালের হিসাব। জাহাজী মাল খালাস করিতে হইলে ছারপত্র চাই, খালাসীদের ঘুঁস চাই। রদি মালের বিলি-বন্দোবস্ত চাই। তার উপর, নিমকহারাম গোমস্তাদের রাহাখরচ ও দরমাহা লইয়া নানা ফেসাৎ। বন্দরে বন্দরে একটু তদবিরের অভাব হইলে বেইমান আমলাদের বজ্জাতিতে দুদিনে ফতুর। মহাজন পয়মাল, গোলামের বাহার! খেসারতের দাবীতে নালীশ রুজু করিলে তাঁইস দেওয়া যায়, তাতে লাভ কি। তবে আয়েন্দার দরুণ তরীপৎ হয়। খামখা দেরী না করিয়া এত্তালা দিতে গেলাম কাচারীতে—মোকদ্দমা দেওয়ানী হৌক, আর ফৌজদারী হৌক, এজাহার দিয়া দেখ, আরজী দাখিল হইতে আরম্ভ করিয়া সওয়াল জবাবের মধ্য দিয়া জান বাচ্চা শুদ্ধ নিকাশ পর্য্যন্ত সবই মুসলমানের কারখানা আর কারসাজি। লিখিতে বসিলে দোয়াত, কলম, কাগজ, আর পড়িতে বসিলে কেতাব, মায় রাস্তায় চলিবার রোশনাই—সব আমাদের যাবনিক। তামাম দিন কেন, সারা বছর যে হাজারো রকমের জিনিস খাইতেছি, হুঁসিয়ার হইয়া হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যায়, ইহার কোনটাই বাদ্‌ যায় না।

বাল্যকালে মাতবর ব্যক্তিদের মুখে হামেসা যে সব কথা শুনিতে পাইতাম, সেগুলির সংস্কৃত মূল না পাইয়া তাহাদিগকে 'দেশজ' বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলাম। পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে সেগুলির পয়া কম; অথবা ইংরাজী সেগুলির স্থান জবরদখল করিয়াছে। কিন্তু দিল্লী অবস্থানকালে খেয়াল করিয়াছিলাম যে উর্দ্দু কথাবার্ত্তার মধ্যে

সেগুলি হাজির রহিয়াছে। তখন আমার ‘দেশজ’ ভ্রান্তি কাটিয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম, প্রাচীনগণ যে জায়গায় প্রচুর-পরিমাণে আরবী ও ফারসী শব্দ ব্যবহার করিতেন, নব্যগণ সেখানে অল্পমাত্রায় ইংরাজীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমার পিতা বলিতেন ইমারৎ, আমি বলি বিল্ডিং (building), তিনি বলিতেন দেউড়ীদালান (দরদালান), আমি বলি গেট্ (gate); উভয়ের সঙ্গেই বাংলার সমান সম্বন্ধ (পণ্ডিতেরা না কি বলেন, ইংরাজীর সঙ্গে সম্বন্ধ নিকটতর)। তবে নব্যগণের চেষ্টাকে বাতিল করিবার কারণ কি? তাহারা তো প্রাচীনগণেরই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া মাতৃভাষার জায়দাদ বৃদ্ধির প্রয়াস পাইতেছেন। প্রাচীনেরা যেখানে বলিতেন হিস্যা বা সরীক, নব্যেরা সেখানে বলেন share বা partner. তাঁহাদের দস্তখৎ, আমাদের signature, তাঁহাদের বন্দোবস্ত আমাদের settlement তাঁহারা যেখানে রফা করিতেন আমরা সেখানে decide করি; তাঁহারা করিতেন আপোস, আমরা করি compromise. তাঁহাদের যেটা মনাসিফ্ হইত না, আমরা সেটা like করি না। তাঁহারা মুনাফা চাহিতেন, আমরা চাই profit. তাঁহাদের লেপাফা, আমাদের envelope. তাঁহাদেরই তো দরবার ও সরবৎ আমাদের শীত-গ্রীষ্মের সম্বল। তাঁহাদেরই গালিচাকে আমরা carpet বলি; তাঁহাদেরই জেনানা ভাঙ্গি, পর্দ্দা তুলি, নিশান উড়াই। আসবাব ও আবকারী ছিল তাঁদেরই বুলি, আমরাও তাই-ই বলি। ইহাতে আমাদের কোনই বাহাদুরি নাই। দেমাক করিবার ফুরসুৎ কোথায়? ইহাতেও তকরার মিটিল না, জানি; তবুও আর কথা বাড়াইব না। যদি নব্যদিগের ভাষা খিচুরী হয়, তবে প্রাচীন ভাষাটা খিচুরী নয় কেন? এইমাত্র তফাৎ যে, ওটা মোগলাই খিচুরী। কিন্তু যে পেটে মোগলাই খিচুরী হজম হইয়াছে, তাহা যে ইংরাজীর একটু আমেজ বরদাস্ত করিতে পারিবে না তাহা বলা যায় না। বরং তাহাতে আরাম পাইবারই কথা। এই খিচুরীর মাল-মসলার আন্দাজ করিবার জন্য আমি একটা ক্ষুদ্র জায় তৈয়ার করিয়াছি। এটা খসড়া মাত্র, ওজেবাদ দিয়া আপনারা ইহাকে দুরস্ত করিয়া লইবেন। তবে আগে হইতেই বলিয়া রাখি, এ খিচুরীতে চা'ল ডা'ল ছাড়া আরও অনেক চিজ্ আছে—হরেক রকম মসলা ও পোস্তদানা আছে, বাগের খাসা বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্ এবং ময়দানের তাজা তরমুজের রস আছে; তোফা তোফা পোস্ত-দানা, বিহিদানা ও আক্রোট আছে। বেশীর ভাগ, এ খিচুরীতে বাজারের হালুইকরের বায়না দেওয়া হালুয়া ও সফেৎ ময়দার ময়ান দেওয়া সাদা মুরগীর সুরুয়া পড়িয়াছে। তবে চর্ব্বী নাই, পেঁয়াজ আছে। সোরা খাটে নাই। আরও দুটো জিনিষ আছে—তা জো-আন ও জরদা রংএর জাফ্রান। এ বাবদে অনেক খরচ হইয়াছে, কিন্তু বান্দার ডর নাই। সে বকিলও নয়, ফোতও নয়। বাবুর্চ্চি কয়লায় রসুই করিয়া এই খানা প্রস্তুত করিয়াছে। ইহা খোস খবর। চাকরের জবানী বিশ্বাস না হয়, সরেজমিনে তদারক করিয়া কিনারা করুন, ঝটপট্ কাজ হাসিল হইবে। সবুরে মেওয়া ফলে বলিয়া জল্‌দির কাজে দেরী করিবেন না।

আপনারা আমার এই তালিকার তারিপ করিবেন না, তা আমি জানি; যে হেতু ইহা হরফ্ অনুযায়ী, বড়ই সাবেকী; হাল্ কেতা মাফিক চিজ্‌ওয়ারী নহে। হুজুরে সেলাম দিয়া হলপ করিয়া বলিতে পারি, তাহাতে মেহনৎ অনেক। তবে যদি নেহাৎ নাচার-বন্দ হন, তবে পোষাক ও আসবাব তোষাখানায় দাখিল করিয়া দিতেছি, যা ফরমাস করিবেন, বিলকুল তাই হাজির পাইবেন। না হয়, মুহুরীকে তলপ করুন, সে হিসাব দেখিয়া লইবে। যেন আখেরিতে বেকুব বনিতে না হয়। দিগদারী ও পেরাশীন হইয়া কাজ নাই। আক্কেল সেলামীর ডর আহম্মকেরও আছে। রোক্ সোদ্ হওয়ার পর কশুরি ধরিয়া লাভ নাই। কি মুস্কিল! ফরাস গরহাজির, তদ্‌বির করিবার কেহই নাই, আমার ফর্দ্দটাই পেশ করিয়া খালাস——

অ—অকু (স্থান), অক্কা, অছি, অছিলা, অন্দর।

আ—আইন, আওয়াজ, আক্কেল, (বে-আক্কেল), আখেজ, আখের, আখ্‌তা, আজগবী, আজব, আজবক, আজবোজ, আজান, আতর, আতরদান, আতস, আতসী, আদৎ, আদতে, আদদ্, আদব, আদমসুমারী, আদ্‌মি, আদা, আদালত, আন্দাজ, আন্দাজী, আপোস, আফ্‌শোস, আবওয়াব, আবকারি, আবদার, আবাদ, আব্‌হাল, আব্রু, আম্‌দরবার, আমন (ধান্য), আমদানি, আমল, আমলা, আমানৎ, আমীন, আমীর, আমেজ, আয়না, আয়ন্দা, আয়েষ, আরক, আরজ, আরজি, আরজবেগী, আরবী, আরাম, আরিন্দা, আলগোছ, আলপিন, আলবৎ, আলবালা, আল্লা, আলাদা, আলুফা (লাফা, ফাও), আবলুস, আশমান, আশমানি, আশরফি, আসর, আসল, আসবাব, আসান, আসামী, আস্কারা, আস্তাবল, আস্তর, আস্তীন, আস্তে, আস্‌নাই, আহল, আহাম্মক।

ই—ইজ্জৎ, (বে-ইজ্জৎ), ইজা, ইজার, ইজারা, ইজারদার, ইনাম, ইয়ার, ইরশাল, ইল্লৎ, ইলাহী, ইশারা, ইশাদী, ইস্তমাল, ইস্তাহার, ইস্তাফা।

উ—উকীল, উমেদার, উজবক, উজীর, উশুল।

এ—একছড় (আকছের) একতরফ, একতরফা, একতিয়ার, একড়ার, এজমালী, এজলাস, এজাহার, এতালা, এস্তাহাম, এমারৎ, এলাকা, এবারৎ।

ও—ওক্ত, ওকালৎনামা, ওকালতি, ওজন, ওজর, ওজুহাত, ওজেবাদ, ওমরা, ওয়াকিপ, ওয়াকুব, ওয়াদা, ওয়াজীব, ওয়ারীশ, ওয়াশীল, ওয়াপেশ, ওরফে, ওস্তাদ, ওস্তাগর।

ক—কড়ার, কঞ্চি, কদম, কদর, কবলা, কবুতর, কবুল, কবুলিয়ত, কব্জা, কর্জ্জী, কম, কমবক্ত, কয়লা, কয়েদ, কয়েদী, করম, কর্জ্জ, কর্জ্জা, কলপ, কলম, কলিজা, কল্‌মা, কশাই, কশুর, কস্‌রৎ; কাগজ, কাচারী, কাঁচি, কাজি, কাননগুই, কাফের, কাবু, কাম্‌রা, কামান, কামানি, কাহিল, কায়দা (বে-কায়দা), কায়েমী, কারবার, কারখানা, কারসাজি, কারপরদাজ, কারিগর, কার্দ্দানি, কালিয়া, কাবাব, কাবার, কাস্তগীর; কিংখাপ, কিস্তা, কিফায়েৎ, কিনারা, কিস্মৎ, কিস্‌মিস্, কিস্তি; কুচ্‌কাওয়াজ, কুঁজা, কুঞ্জী, কুত, কুর্নীশ, কুর্শী, কুলী, কুলুপ, কুস্তি; কেতা, কেতাব, কেরামৎ, কেল্লা; কোতোয়াল, কোতল,

কোপ্তা, কোমর, কোমরপটি, কোমরবন্ধ, কোর্ম্মা।

খ—খত, খতম, খতিয়ান, খপ্‌ছুরুত, খয়রাৎ, খয়ের খাঁ, খরচ, খরিদ্‌, খরিদা, খরিদ্দার, খলিফা, খবর, খবরদার, খবরদারী, খসড়া, খসখসিয়া; খাক্‌, খাজাঞ্চী, খাজানা, খাতা, খাতির, খান্‌কী, খান্‌সামা, খানা, খানা-বাড়ী, খানাতালাসী, খানেজাদ্‌ খাপ ছাড়া, খাম্‌, খামাখা, খামার, খারাপ, খারিজ, খারিজ-দাখিল, খালাস, খালাসী, খালশা, খাস্‌, (খাস-কামরা, খাসখামার, খাসমহল), খাসবরদার, খাস্তা; খিদ্‌মতগার; খুজবা, খুঁটিগাড়ী, খুন, খুন্‌সী, খুরসী, খুসী; খেতাব, খেয়াল, (খাম্‌ খেয়ালি), খেলাৎ; খোজা, খোদ্‌, খোদকস্তা, খোদা, খোসামুদি, খোসামুদে, খোসখবর।

গ—গজব, গজল, গদি, গতখামার, গতরাইয়র্তী, গরজ, গরহাজির, গরিমসি, গরীব, গর্দ্দান, গদ্দিশ, গস্ত, গস্তানি; গালি-গালাজ, গালিচা; গিরা; গুজব, গুজরাণ, গুজারৎ, (মাল) গুজারি, গুণা, গুণাগারি, গুলজার; গোমস্তা, গোয়েন্দা, গোলা, গোলাপ, গোলাম, গোলন্দাজ, গোসা।

ঘ—ঘুষ, ঘুষখোর।

চ—চরবী, চশমখোর, চশমা; চা, চাকর, চাকরী, চাকরান, চাকরাণী, চাঁদা, চাদর, চাপ্‌রাসী, চাপ্‌রাস, চাপ্‌কান, চারা, চাবুক, চালাক, চালাকি, চাহিদা; চিড়িয়াখানা; চীক, চীজ; চেক্‌, চেরাগ, চেহারা; চোপদার, চোগা, চোস্ত; চৌকীদার।

ছ—ছিলিম।

জ—জখম, জঙ্গী, জঞ্জীর, জবর, জবরদস্ত, জবরদস্তি, জবাই, জবান, জবানী, জবানবন্দী, জবাব, জব্দ, জমা, জমাওয়াশীল বাকী, জমাখরচ, জমাদার, জমাবন্দী, জমায়ৎ, জমি, জমিদার, জম্‌কাল, জরি, জরিপ, জরিমানা, জরুরি, জর্দ্দা, জল্লাদ, জল্‌দি, জশম, জহর, জহুরী; জাদা, জাদু, জান, জানালা, জানোয়ার, জাফরী, জাফ্রান, জামদানী, জামা, জামিন, জায়, জায়গা (বে-জায়গা), জায়গীর, জায়গীরদার, জায়দা, জায়দাদ, জারি, জাল, জালিয়াৎ, জাবেদা, (বেজাবেদা), জাহাজ, জাঁহাপনা, জাঁহাবাজ, জাস্তি, জাহান্নাম, জাহির, জিগির, জিজিয়া, জিনিষ, জিম্মা, জিন; জীন; জুদা, জুম্‌, জুলুম, জুস্‌; জেদ, জের, জেরবার, জেরা, জেলা, জেল্লা, জেহাদ, জোব্বা, জোয়ান, জোর, জোলা, জোলাপ, জোকার।

ত—তক্‌রার, তক্ত, তক্তপোষ, তক্তা, তগাবি, তজদিক্‌, তজ্‌বিজ, তদ্‌বির, তদারক, (বে-তদবির, বে তদারক), তফসিল, তফাৎ, তবক, তবলা, তমসুক, তমাম, তম্বি, তয়ফা, তর, তরকারী, তরপ, তরপদার, তরফা, তরমুজ, (লুঠ্‌)তরাজ, তরাজু, তরাস্‌, তরীপৎ, (বে-তরীপৎ), তর্জ্জমা, তর্ম্মিম, তলব, তলপ, তলবানা, তল্লাস, তস্‌দিক্‌, তসবীর, তস্রুপ, তহরি, তহশীল, তহশিলদার; তাইস, তাক, তাকৎ, তাকাবি, তাকিয়া, তাগাদা, তাগাড়, তাগিদ্‌, তাজ, তাজা, তাজিয়া, তাজী, তাজ্জব, তান্‌জাম, তাম্বু, তাম্বুরা, তামাক, তামাদি, তামিল, তারিখ, তারীপ, তালাস, তালিকা, তালিম, তালুক, তালুকদার, তাবিজ, তাঁবে, তাঁবেদার, তামাসা, তাস, তাসা; তীর, তীরন্দাজ; তুফান, তুরপাই; তেরিজ, তেজারতি; তৈয়ার; তোক্‌, তোপ, তোফা,

তোরা, তোয়াক্কা, তোয়াজ, তোরা, তোশক, তোষাখানা, তোষামোদ ; তৌজী।

থ—থানা ; থোরা।

দ—দখল, দখিলকার বা দখলদার (বে-দখল), দজ্জাল, দপ্তর, দপ্তরি, দফা, দফাদার, দম্, দরওয়াজা, দরকার, দরখাস্ত, দরজী, দরগা, দরদ্, দরদী, দরদালান (দেউড়ী দালান), দরমাহা, দরবার, দরবেশ, দরাজ, দরিয়া, দরী, দরুণ, দরোয়ান, দলীল, দস্তখত, দস্তবস্ত, দস্তানা, দস্তাবেজ, দস্তুর (বে-দস্তুর), দস্তুরি ; দাও, দাওয়া, দাখিল, দাখিল খারিজ, দাখিলা, দাগ, দাগা, দাগাদার, দাগাবাজ, দাগাবাজি, দাগী, দাঙ্গা, দাঁতভোলা, দাদন, দানা, দানাদার, দাম্কি, দায়ের, দায়রা, দারোগা, দালান, দালাল, দাবাই, (দাওয়াই), দাবী, দাবীদার, দারু ; দিক্, দিগ্দারি, দিগর, দিল, দিস্তা ; দুনিয়া, দুশ্মন (দুস্মন্), দুস্বা, দুরস্ত (বে-দুরস্ত) ; দেওয়ান, দেওয়ানখানা, দেওয়ানী, দেওয়াল, দেদার, দেমাক্, দেরাজ, দেরী ; দোকান, দোয়া, দোয়াত, দোলনা, দোস্ত, দোহাই, দৌলত।

ধ—ধমক্।

ন—নকর, নকরী, নকল, নকীব, নকাশি, নগদ, নজর, নজীর, নজরনামা, নদারৎ, নফর, নবাব, নবীশ্, নমাজ, নমুনা, নরম, নরিনামা, নসীব, নহবৎ ; নাখুদা, নাখোচ, নাচার, নাছোরবন্দ্, নাজীর, নায়েব, নারাজ, নাস্পাতি, নালীশ, নাস্তা, নাস্তানাবুদ ; নাজিম, নাজেহাল, নান্খদাই, নাবালিশ, নিকা, নিখামাস্, নিজাম, নিজামৎ, নিমকহারাম, নিরীখ ; নীলাম, নীশান ; নুর (কোহিনুর) ; নেকা, নেগুরা, নেবাজ, নেশা, নেহাৎ ; নৌবত, নৌকা।

প—পঞ্জা, পত্তন, পত্তনীদার, পত্তনি, পয়গম্বর, পয়দল, পয়জার, পয়মাল, পরবার, পরওয়ানা, পরগণা, পরদা (বে-পর্দা), পরদানশীন, পরী, পরোয়া, (বে-পরোয়া), পলক, পলিতা, পল্টন, পশম, পশমী, পসন্দ (বে-পসন্দ) ; পাইকস্তা, পাইকার, পাইকারী, পাইখানা, পাখোয়াজ, পাঁজা, পাজামা, পাঞ্জাব, পাত্সা, পাপোষ, পায়া (বে-পায়া), পালোয়ান, পাল্লা, পাহাল ; পিক্, পিক্দান, পিচ্কারী, পিলসুজ, পিয়াজ, পিরান ; পীর, পীলখানা ; পেগম্বর, পেঁচ, পেয়ালা, পেরাসীন্, পেশ্, পেশকার, পেশকোস্, পেশবাজ (পেশোয়াজ), পেশা, পেশাদার, পেশাদারী, পেস্তা ; পোক্ত, পোদ্দার, পোষাক, পোষাকী, পোস্ত, পোস্তা, পোস্তাবন্দী।

ফ—ফয়সালা, ফকীর, ফতুর, ফতে, ফয়দা (বে-ফয়দা), ফরমাস, ফরাস, ফরিয়াদি, ফন্দ, ফন্দী, ফরমান, ফর্দ্দ, ফসল ; ফাজিল, ফাঁদ, ফানস্, ফালতু ; ফিকির, ফিরিঙ্গী, ফিরিস্তি, ফি-আদ্মি ; ফুকার, ফুর্ণী, ফুরসুৎ ; ফেরার, ফেরারী, ফেরেব, ফেসাৎ ; ফৈজৎ, ফৈরাদ্ ; ফৌজ, ফৌজদার, ফৌজদারী, ফৌত।

ব—বকেয়া, বক্শিস্, বক্সী, বক্লিল, বখেয়া, বগল, বজায়, বজ্জাত, বজ্জাতি, বজায়, বদল, বদলান, বদ্, বদ্নাম, বদ্মা'স, বনাত, বনিবনাও, বন্দর, বন্দুক, বন্দোবস্ত, (বে-বন্দোবস্ত), বমাল, বম্বেটিয়া, বয়ান, বয়রা, বরকন্দাজ, বরখাস্ত, বরতরফ, বরদাস্ত, বরাৎ, বরাবর, বর্গাদার ; বাকি (বে'বাক্), বাগ, বাজ, বাজার, বাজী, বাজীকর, বাজু, বাজে, বাতিল, বাদ্, বাদা (বন), বাদ্সা, বাদাস,

ন্দা, বান্দী, বাণ্ডা, বাবদ, বাবা, বাবু, বাবুগিরি, বায়না, বামাল, বারন্দা, বালাই, বালাখানা, বালাপোস, বালিশ, বাসিন্দা, বাস্, বাহাদুর, বাহার; বিবি, বিবিয়ানা, বিহিদানা; বুনিয়াদ্, বুনিয়াদী, বুরুজ্, বুলি, বুল্‌বুল্; বেওয়া, বেকার, বেকুব, বেগম, বেজার, বেমার, বেশী, বেলোয়ারী, বোচকা।

ভ—ভাও; ভিস্তি; ভেট্, ভেল।

ম—মক্কেল, মক্স, মখমল, মগজ, মখুব, মজবুত, মজলিস, মজা, মজাদার, মজুত, মজুমদার, মজুর, মজুরী, মঞ্জুর (না-মঞ্জুর), মতলব, (বে-মতলব), মদক, ময়দা, ময়দান, ময়ান, মরমর, মর্জি, মর্চে, মফস্বল, মবলগ, মলম, মশক, মশহরা, মশাল, মশালচি, মস্‌জিদ, মস্‌লা, মল্লিক, মস্ত, মহকুমা, মহল, মহলত, মহলদার, মহলা, মহলানবিশ, মহল্লা, মহরম; মাগন, মাগ্‌না, মাফিক, মাজরা, মাৎ, মাতব্বর, মাদা, মাদী, মাপ, মানা, মামুলি, মাম্‌লা, মায় (খরচা), মারফৎ, মাল, মালখানা, মালগুজারী, মালকোচা, মালসাট, মালাম, মালিক, মালিকানা, মালুম (বেমালুম), মাশুল, মাসকাবার, মাস্তুল, মাহা, মাহাল্লা, মাহাতাব, মাহিনা, মাহুত; মিজ্‌রাফ, মিঞা, মিনার, মিয়াদ, মিরাস, মিশিল, মিসর, মীর; মুকাবেলা, মুদ্দাই, মুদ্দৎ, মুনাফা, মুন্‌সী, মুন্‌সেফ্, মুনাসিফ্, মুনসবদার, মুরগী, মুরুচা, মুরুব্বি, মুরুব্বিয়ানা, মুলুক, মুল্লুক, মুর্দ্দা, মুর্দ্দাফরাস, মুশুকী, মুসলমান, মুসাব্বর, মুসাবিদা, মুসাফেরখানা, মুস্কিল, মুহুরী, মেজাজ, মেতর, মেহনৎ, মেহেরবাণি, মেরামৎ (বে-মেরামৎ), মেয়াদ্দাই; মোক্তা, মোক্তার, মোকদ্দমা, মোকাম, মোগল, মোচ, মোজা, মোতায়েন, মোতাল্লিক, মোল্লা, মোলায়েম, মোসাহেব, মোহর; মৌজা, মুর্দ (মৌল), মৌরুসী।

র—রওনা, রগ, রদ্, রদী, রপ্ত, রপ্তানি, রফা, রসদ্ (রসিদ্); রাইয়ত, রায় (judgment), রায়বার, রাহাখরচ, রাহাজানি; রুজু; রেকাব, রেওয়াজ, রেয়াৎ, রেজকি, রেজা, রেশম, রেশালদার, রেহান্; রোক্‌শোধ, রোকা, রোজ, রোজগার, রোজনামা, রোজা, রোশনচৌকী, রোশনাই।

ল—লবজান, লজ্জ, লস্কর; লাখ্‌রাজ, লায়েক, লালপোস্, লাস্; লেপ, লেপাফা, লেবু; লোকসান।

ব—বাগিচা, বাচ্চা; বিলাত, খিল্‌কুল্; বুজরুকি; বে-আব্রু, বে-আরাম, বেইমান, বে-আদব, বে-আদবী, বে-কসুর, বেজুত, বেদম, বেদানা, বেদিন, বেয়াড়া, বেহদ্দ, বেহায়া, বেহুদা, বেহুঁশ, বে-হিসাবী (বেতাল, বেসুর)।

শ—শয়তান, শরম; শারার, শামীয়ানা, শালিয়ানা, শালতামামি; শিকস্ত, শিকার, শিকারী, শিশি, শিপ্‌সরকার; শোরা, শোর।

স—সইস, সওগাত, সওয়ার, সওয়ারি, সওয়াল, সওদা, সওদাগর, সখ্, সনাক্ত, সফর, সফরিয়া, সহবৎ, সস্তা, সতরঞ্চ, সদর, সনদ্, সফেদ্, সবুর, সরগরম, সরদার, সরদী, সরপেচ, সরপোস, সরফরাজ, সরবরাহ, সরাই, সরাসরি, সরীক, সরেজমিন্, সরবৎ, সরকার, সরকারী, সহর, সহি; সাকৃয়েত, সাকিন, সাফাই, সাঁজোয়া, সাজোয়াল, সাদি, সাধ, সাবান, সাবার, সাবাস, সাবুদ, সাবেক, সাবেকী, সামাল, সামিল, সালীস, সালীসী,

সায়রাৎ, সারঙ্, সারাদিন, সাহেব ; সিন্নি, সিক্‌দার ; সুরু, সুরুয়া, সুমারনবীশ, সুপত (সুবত), সুপারীশ, সুরকি, সুরাথ ; সেওয়ায়, সেথ, সুবা, সুবাদার, সেতার, সেয়ানা, সেলাম, সেলামী ; স্রেব ; সৌখীন।

হ—হক্, হজম্, হজরৎ, হদ্দ, হয়রান্, হরকরা, হরফ্, হরেক, হল্লা, হলকা, হলপ, হলপানা ; হাউস্, হাউই, হাওদা, হাওয়া, হাওলাৎ, হাকিম, হাঙ্গামা, হাজ, হাজার, হাজারি, হাজি, হাজির, হামিল, হামেশা, হারাম, হাবালৎ, হাবিলদার, হ্যালি, হালুইকর, হালুয়া, হাব্‌সী, হাবেলি, হাসিল ; হিজরি, হিন্দু, হিম্মত, হিসাব, হিস্তা ; হুকুম, হুজুগ, হুজুর, হুঁশা, হুসিয়ার, হুসিয়ারী, হুবহু ; হেকমৎ, হেপাজাত, হেস্তনেস্ত ; হৌজ।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

রসের রূপ

নায়ক-নায়িকার স্বরূপ বিচার ও শ্রেণীবিভাগ

রস দুই জাতীয়, এক আগন্তুক, অপর স্থায়ী। হাস্য, অদ্ভুত, করুণ, রুদ্র প্রভৃতি আগন্তুক রস। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী স্থায়ী রস। হাস্যাদিকে আগন্তুক বলা হয় এই জন্য যে, এরা ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠে ও ক্ষণে ক্ষণে মিলাইয়া যায়। একই মুহূর্ত্তে একই ব্যক্তির অন্তরে হাসির ফোয়ারা ফুটিয়া পর মুহূর্ত্তেই আবার অবস্থান্তর ঘটিয়া গভীর মর্ম্মবিদারী করুণার নির্ঝর ছুটিতে পারে। আকস্মিক কারণে হাস্যাদি রসের উদয় হয়। আবার অন্য ঘটনাপাতে অমনি তাহা নষ্ট হইয়াও যায়। এ সকল রস কোথাও নিত্য প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু দাস্যাদি রসের ধর্ম্ম এরূপ নহে। একবার এ সকল রসের যথাযোগ্য স্ফূর্ত্তি হইলে, আর তাহা কখনই নষ্ট হয় না। প্রভুর প্রতি দাসের, সখার প্রতি সখার, সন্তানের প্রতি জনক-জননীর, পতির প্রতি সতীর কিম্বা সতীর প্রতি পতির অথবা নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি—যে রতি, তাহা একবার জন্মিলে আর কদাপি বিনষ্ট হয় না। হাস্যকর বস্তু বা বিষয়ের অনুপস্থিতিতে হাস্যরস বেশিক্ষণ থাকিতে পারে না ; কিন্তু প্রভুর বা সখার বা সন্তানের বা প্রিয়জনের অনুপস্থিতিতে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর রসের কখনওই বিলোপ হয় না। বাহিরের আশ্রয় নষ্ট বা অন্তর্হিত হইলেও দাস্যাদি রস অন্তরের স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকে যে কেবল তাহা নহে, অনেক সময় আরো বেশি ফুটিয়া উঠে। দাস্য-সখ্যাদির এই স্থায়িত্ব আছে বলিয়াই, এইগুলিকে স্থায়ী রস বলা হয়। আর এই সকল স্থায়ী রসই প্রকৃত পক্ষে হাস্যাদ্ভুতাদি আগন্তুক রসের বিশিষ্ট ও নিত্য আশ্রয় এবং লীলাভূমি। কারণ হাস্যকর বস্তু বা ঘটনার উপস্থিতিতেই যে হাস্যরসের উদয় হয়, তাহা নহে। যে হাসিবে তার মনের অবস্থাও হাসিবার উপযোগী হওয়া আবশ্যক। এই কারণে

এই সকল আগন্তুক রসের স্বাভাবিক আলম্বন ও উদ্দীপনা সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ বিপরীত রসেরও সঞ্চার করিয়া থাকে। শোকার্ত্তের নিকটে কৌতুক-পরিহাস হাস্যের উদ্রেক করে না, বীভৎস রসকেই জাগাইয়া তোলে। আপনার সন্তানের রুদ্রমূর্ত্তি জননীর অন্তরে ভীতির নহে, কিন্তু কারুণ্যেরই সঞ্চার করিয়া থাকে। অপরের নিকট যাহা অদ্ভুত, প্রেমিকের চক্ষে তাহাই সহজ ও সুমধুর ও স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ হাস্যাদি রসের আশ্রয় বাহিরের বিষয় বা ঘটনা নহে, কিন্তু আমাদের অন্তরের ভাব। একই বিষয় বা ঘটনা, এই জন্য, ভিন্ন ভিন্ন লোকের অন্তরে বিভিন্ন রসের সঞ্চার করিয়া থাকে। আর আমাদের এই সকল আন্তরিক অবস্থা বা ভাব প্রায়ই সখ্যাদি স্থায়ী রসের বিবিধ অবস্থার উপর নির্ভর করে। নিজ-স্বরূপে হাস্যাদি আগন্তুক রস আপনার বিপরীত রসের এক সঙ্গে প্রকাশিত হয় না এবং হইতেই পারে না। রুদ্র ফুটিলেই হাস্য উড়িয়া যায়। করুণার আবির্ভাবে বীভৎস নষ্ট হয়। কিন্তু দাস্য-সখ্যাদি স্থায়ী রসের আশ্রয়ে এ সকল আগন্তুক রস আপনার বিপরীত রসের সঙ্গে কেবল যে পাশাপাশি থাকে তাহা নহে, কিন্তু গঙ্গা-যমুনার মতন পরস্পরের মধ্যে পরস্পরকে মিলাইয়া মিশাইয়া দিয়াও বিচিত্র রস-মাধুরী ফুটাইয়া তুলিতে পারে। হাস্যাদি আগন্তুক রসের এ সকল অদ্ভুত মিশ্রণ হইতেই সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অনুপম ও অনন্ত বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে। এই বৈচিত্র্য দাস্যাদি সকল রসেতেই স্বল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মাধুর্য্যের বিচিত্রতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহার কারণ এই যে, রস-পঞ্চকের মধ্যে মাধুর্য্য রসই সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। সকল রসেরই তিনটী অবস্থা আছে, পূর্ব্বরাগ, মান ও বিরহ। কিন্তু মাধুর্য্যে পূর্ব্বরাগ, মান, বিরহাদি যে তীব্র প্রখরভাব ধারণ করে, দাস্যের তো কথাই নাই, কারণ দাস্যেতে ঐশ্বর্য্যভাব ঐকান্তভাবে নষ্ট হয় না, হইলে তাহা বাৎসল্যে পরিণত হয়,—কিন্তু সখ্যে বা বাৎসল্যেও তাহা দেখা যায় না। মাধুর্য্যের রূপ-বৈচিত্র্য, এই জন্য, সকল রসের অপেক্ষা অদ্ভুত ও বিবিধ। আমাদের রসতত্ত্ববিদেরা বলেন যে মাধুর্য্যেতে একটা দুইটা নহে, কিন্তু চৌষট্টি রস ফুটিয়া উঠে। সে কথা পরে বলিব।

এই জন্য পূর্ব্বরাগের রূপও একটা দুইটা নয়, কিন্তু অনেক। অন্তরে রসবিশেষের স্ফুর্ত্তি পাইয়া, তাহা প্রবল হইয়া উঠিলেই রসিকজনের স্নায়ুমণ্ডলকে যাইয়া অধিকার করে, এবং এই সকল স্নায়ুকে আশ্রয় করিয়া শরীরের সর্ব্বত্র একটা না একটা বিশেষ মূর্ত্তির প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে,—চক্ষে মুখে সকল অঙ্গে একটা না একটা বিশিষ্টতা ফুটাইয়া তোলে। এই রসের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এই বিশিষ্টতাটীও নষ্ট হইয়া যায়। এই বিশিষ্টতাই রসের রূপ বা মূর্ত্তি। যখন যে রসের রাজ্য যার উপরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখনই তার নিজস্ব, বিশিষ্ট রূপটীও তাহার শরীরে ফুটিয়া উঠে। সখ্যাদি কোনও রসই নিরাকারও নয়, একাকারও নয়। জটিলতাই এ সকল স্থায়ী রসের প্রাণ। হাস্য, রুদ্র, করুণ, ভয়ানক, বীভৎস প্রভৃতি আগন্তুক রস একাকার, simple, জটিল

বা complex নহে। কিন্তু এই জটিলতা বা complexityই দাস্যাদি স্থায়ী রসের বিশেষ লক্ষণ। আর হাস্যরৌদ্রাদি আগন্তুক রসের আশ্রয়েই দাস্যসখ্যাদি স্থায়ী রসের এই জটিলতার উৎপত্তি হয়। যুগপৎ লালসা এবং ভয়, হাস্য এবং বীভৎস, রৌদ্র ও কারুণ্য এ সকল পরস্পরবিরোধী রস, সখ্যাদিকে আশ্রয় করিতে পারে। এইরূপে পরস্পরবিরোধী আগন্তুক রসের যুগপৎ প্রকাশেই ব্যভিচারী ভাবের সৃষ্টি হইয়া সখ্যাদি স্থায়ী রসের এই জটিলতা ও রূপবৈচিত্র্যের প্রতিষ্ঠা করে।

বহুবিধ হেতুর সমাবেশে মাধুর্য্যের এই জটিলতার ও রূপবৈচিত্র্যের উৎপত্তি হয়। প্রথমতঃ নায়ক-নায়িকার মূল প্রকৃতি। সকল নায়ক বা সকল নায়িকাই এক প্রকৃতির নহেন। কেহ বা পূর্ণতম, কেহ বা পূর্ণতর, কেহ বা পূর্ণ। অর্থাৎ কাহারও মধ্যে নায়ক-স্বভাব পরিপূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, কাহারও মধ্যে তদপেক্ষা কিছু কম, আর কাহারও মধ্যে বা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বিকশিত হইয়াছে। তার পরে, ভিন্ন ভিন্ন নায়কের সাধারণ মনুষ্য প্রকৃতিও এক নহে। আমাদের রসতত্ত্বে, এই সাধারণ মনুষ্য প্রকৃতির বিচার করিয়া, চারিপ্রকারের নায়কের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম ধীরোদাত্ত, দ্বিতীয় ধীর-ললিত, তৃতীয় ধীরোদ্ধত, চতুর্থ ধীরশান্ত। ধীরোদাত্ত নায়ক গম্ভীর, বিনয়ী, সকল লোককে সর্ব্বদা যথাযোগ্য সম্মাননাকারী। ইঁহারা কখনওই আপনাকেও ভুলেন না, অপরকেও ভুলেন না; লৌকিক ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতিনীতিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া, একেবারে রসবিশেষের তরঙ্গে আপনাকে ভাসাইয়া দেন না। ইঁহাদের রতি সর্ব্বাবস্থাতেই সুসংগত; ইঁহাদের ব্যবহার সর্ব্বথাই শাস্ত্রশাসনানুগত। শ্রীরামচন্দ্রকে ধীরোদাত্ত নায়কের আদর্শ বলা হয়। যিনি কন্দর্পের ন্যায় প্রেয়সীর বশ, সর্ব্বচিন্তাবিরহিত, নব যৌবনসম্পন্ন এবং নৃত্যগীতাদিকলাকুশল, তাঁহাকেই ধীরললিত বলে। যিনি উদ্ধত, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, ক্রুদ্ধস্বভাব এবং কৈতবাদি গুণযুক্ত, তাঁহাকে ধীরোদ্ধত কহে। আর যিনি ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয় ও শাস্ত্রদর্শী তাঁহাকেই ধীরশান্ত নায়ক বলা হয়।

রসের মূর্ত্তি বা রূপের আলোচনায়, নায়ক-নায়িকার এ সকল শ্রেণীবিভাগকে উপেক্ষা করা যায় না। মাধুর্য্যরস যাঁহাতে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি পাইয়াছে, তিনিই পূর্ণতম নায়ক। সুতরাং এই রসের বিভিন্ন মূর্ত্তি তাঁর মধ্যে যতটা পরিস্ফুট হইবে, অপরের মধ্যে কখনওই তাহা সম্ভব নহে। পূর্ণতম নায়কের মাধুর্য্যই জীবনের প্রধান ও একমাত্র উপজীব্য। বৈষ্ণবরসতত্ত্ববিদেরা শ্রীকৃষ্ণকেই নায়কচূড়ামণি বলেন, আর গোকুলেই তাঁর নায়ক-রূপের পূর্ণতম প্রকাশ হইয়াছে বলেন। মথুরায় পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণ। ইহার অর্থ এই গোকুলের শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভাবনাবিরহিত, অপর সকল সম্পর্কশূন্য, একমাত্র ব্রজগোপীদিগের অকৈতব অনুরাগে আবদ্ধ হইয়া, তাঁহারা যেমন সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া, তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ সর্ব্বত্যাগী হইয়া, তাঁহাদেরই মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ব্রজগোপীগণও ব্রজকুল-চন্দ্রমা

ব্যতীত আর কাউকে জানেন না; শ্রীকৃষ্ণও ব্রজগোপীগণ ব্যতীত আর কাহাকে জানেন না। এখানে অন্য ধর্ম্ম নাই, আছে কেবল প্রেমধর্ম্ম। অন্য কর্ম্ম নাই, আছে কেবল প্রেমলীলা। অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই, আছে কেবল শুদ্ধা রতি। এখানে অন্য মন্ত্র নাই, আছে কেবল "কামগায়ত্রী"। এখানে প্রেমালাপই একমাত্র শ্রুতি, নায়কের অনুপস্থিতিকালে তাঁর রূপগুণ ও রসলীলা স্মরণই একমাত্র স্মৃতি; তাঁর প্রীতি সম্পাদনার্থে অঙ্গরাগাদি সাধনই একমাত্র কর্ম্ম; তাঁর রূপই একমাত্র ধ্যান, তাঁর সহবাসই একমাত্র স্বর্গ। মাধুর্য্য এখানে অনন্যপ্রতিযোগী প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই, গোকুলের নায়কই পূর্ণতম। যেখানে মাধুর্য্য এই পরিস্ফুট ও চরম পরিণতি না পাইয়াও, জীবনের সকল কর্ম্মে ও সকল ভাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম ও ভাব হইয়া উঠে, সেখানে নায়ক পূর্ণতর। এখানে মাধুর্য্যরস ও মাধুর্য্যলীলাই তাঁর অনন্য-আশ্রয় ও উপজীব্য নহে। আরো আশ্রয় ও উপজীব্য আছে; কিন্তু তন্মধ্যে মাধুর্য্যই সর্ব্বপ্রধান। আর যেখানে মাধুর্য্যের এই প্রাধান্যটুকুও একান্ত প্রতিষ্ঠিত নহে, সেখানেই নায়ক পূর্ণ। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ নায়ক মাত্র। পূর্ণতরও নহেন, পূর্ণতম তো নন‌ই। এখানে তিনি অন্যকামনাশূন্য নহেন, অন্যকর্ম্ম-বিরত নহেন, অন্য ধর্ম্মের অতীত নহেন। এখানে তিনি রাজবিধি, সমাজবিধি, সকল বিধির অধীন; বহুতর সম্বন্ধে আবদ্ধ; রাষ্ট্রীয় কর্ম্মের ও রাষ্ট্রীয় নীতির অনুশীলনে রত। এখানে তিনি ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতেছেন, জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে ব্যাপৃত; স্বর্গমোক্ষাভিলাষিণী ধর্ম্মপত্নীগণ এখানে তাঁর মাধুর্য্য-রতির আশ্রয় ও আলম্বন। বৃন্দাবন হইতে দ্বারকা বহু দূরে। মথুরা বৃন্দাবনের উপকণ্ঠে। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের ভাবকে চাপিয়া রাখিয়াছেন মাত্র, ভুলিয়া যান নাই। সম্ভোগ নাই, কিন্তু লোভ আছে। বাহিরের লীলা নাই, ভিতরের লালসা আছে। এই জন্য এখানে তিনি নায়করূপে পূর্ণতম নহেন, কিন্তু পূর্ণতর।

এই যে রসের প্রগাঢ়তা অনুসারে নায়কের পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম, এই তিন শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে; তাহার দ্বারা মাধুর্য্যের রূপবৈচিত্র্যের একটা হেতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই যে পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম, এই তিন শ্রেণীর সঙ্গে ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত ও ধীরশান্ত স্বভাবভেদে নায়কের যে এই চারি শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে, তাহাতে চারি জাতীয় পূর্ণ নায়ক, চারি জাতীয় পূর্ণতর নায়ক ও চারি জাতীয় পূর্ণতম নায়ক—সর্ব্বশুদ্ধ এই দ্বাদশ প্রকারের নায়কের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এখানেই এই বৈচিত্র্যের শেষ হয় নাই। পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম; এবং ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত ও ধীরশান্ত, এ সকল বিভাগ নায়কের রসের প্রগাঢ়তার ও প্রকৃতির তারতম্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু নায়িকা-সম্পর্কে এখনও নায়িকার শ্রেণী-বিভাগ বাকি আছে। কোথাও বা নায়ক নায়িকার সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ, কোথাও বা আবদ্ধ নহেন। এখানে সমাজনীতি বা ধর্ম্মনীতির কথা তোলা

হয় নাই। এখানে কেবল রসের বা emotion-এর দিক দিয়া এই বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। রসের প্রকৃতি নির্ণয়ে আমরা নিযুক্ত হইয়াছি, রসিক জনের ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত নহি। সে বিচার নিষ্প্রয়োজন নহে, কিন্তু আপাততঃ অপ্রাসঙ্গিক। রসের সম্বন্ধ হয় সমাজধর্ম্ম-সম্মত, না হয় সমাজধর্ম্ম-বিরোধী, এই দুই শ্রেণীর হওয়া সম্ভব। সুতরাং এই বিভাগকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বকার দ্বাদশ প্রকারের নায়ক এখন চতুর্ব্বিংশতি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নায়ক-নায়িকার পরস্পরের সম্বন্ধ কেবল হয় সমাজ ধর্ম্মানুমোদিত না হয় সমাজধর্ম্মবর্হির্ভূত, এই দুইবিভাগেই শেষ হয় না। এ বিভাগও তো বাহিরের কথা। নায়ক আপনার নায়িকার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন, সমাজের ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়াও, তাঁরা পরস্পরের প্রতি কিরূপ ভাব পোষণ করেন, তাহারও তো তারতম্য আছে। এই দিক্ দিয়া আবার নায়ক চতুর্ব্বিধ। এই ভাবে বৈষ্ণব রসতত্ত্ববিদেরা, অনুকূল দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট, এই চারি প্রকারের নায়কের উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি একমাত্র নায়িকাতে অনুরাগী তাঁহাকে অনুকূল; যিনি বহু নায়িকাতে অনুরক্ত কিন্তু সকলের প্রতি সমান প্রীতিমান্, তাঁহাকে দক্ষিণ; যিনি নায়িকার সাক্ষাতে প্রিয়ভাষী ও অপরোক্ষে অপ্রিয় আচরণ করিতে পটু, তাঁহাকে শঠ আর যিনি অপ্রিয়চারী হইয়াও নির্ভয় ও মিথ্যাবাদী, তাঁহাকে ধৃষ্ট নায়ক কহে। উপরোক্ত চতুর্ব্বিংশতি শ্রেণীর নায়কের প্রত্যেকের মধ্যে আবার এই চারি প্রকারেরই নায়ক দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এক নায়কই ষড়নবতি বিধাঃ বা ছিয়ানব্বই প্রকারের হইতে পারেন।

নায়কের রসের আশ্রয় ও আলম্বন নায়িকা। যেমন নায়কের স্বরূপভেদে ভাবের বৈচিত্র্য ঘটে, সেইরূপ নায়িকার স্বরূপভেদেও, এই সকল ভাব আবার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। বৈষ্ণব রসতত্ত্ববিদেরা এ সকলেরও সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই বিচারে একশত বিংশতি প্রকারের নায়িকার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আবার এই একশত বিংশতি প্রকারের নায়িকা উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে তিনশত ষাট প্রকারের হয়েন। কিন্তু এ সকল শ্রেণী-বিভাগের সঙ্গে পূর্ব্বরাগের কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। মানের অত্যদ্ভুত রস-বৈচিত্র্য বুঝিবার সময় এই আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইবে। তখনই ইহার পুনরুল্লেখ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিব।

নায়ক-নায়িকার প্রকৃতি ও প্রকার-ভেদে পূর্ব্বরাগের কিরূপ রসবৈচিত্র্য ও রূপবৈচিত্র্যের প্রকাশ হয়, বারান্তরে তাঁহার বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বিবেকানন্দ স্বামী

বাংলা দেশে বিবেকানন্দ স্বামীর কথন যে যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় আছে। ইংরাজিতে যে কথাটা আছে যে পীর পয়গম্বরের স্বদেশে সম্মান হয় না, সে কথা ভারতবর্ষে ঠিক খাটে না, কেননা এ দেশের লোক ধর্ম্মপ্রবণ, সাধু মহাত্মা পুরুষে তাহাদের আস্থা আছে। মান্দ্রাজে ও অন্য কয়েক অঞ্চলে বিবেকানন্দের স্মৃতি মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় জ্বলিতেছে, কিন্তু আমাদের এই বাংলা দেশে তাঁহার প্রতি তেমন সাধারণ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ নাই। এমন কি, বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে অনেকে বিরক্তি প্রকাশ করেন, কারণ তাঁহাদের বিবেচনায় বিবেকানন্দ অতিরিক্ত প্রশংসিত হইয়াছেন। ইহার দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। প্রথম, বিবেকানন্দ প্রথমে বিদেশে যশস্বী হইয়াছিলেন। যখন তিনি শীকাগো গমন করেন, তখন এ দেশে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত কেহ জানিত না। এই অপরিচিত বাঙ্গালী যুবক হঠাৎ দূর প্রবাসে এক দণ্ডের মধ্যে এমন যশস্বী হইয়া উঠিল কেমন করিয়া? অর্থাৎ, আমরা তাঁহার ক্ষমতা চিনিতে পারি নাই, আর শীকাগো ধর্ম্মসজ্যে বসিয়া বিদেশীরা তাঁহাকে বিচিত্র ক্ষমতাশালী বলিয়া তাঁহাকে জয়মাল্যে ভূষিত করিল। ফলে দাঁড়াইল এই যে, বিদেশীরা আমাদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও গুণগ্রাহী। কিন্তু বাঙ্গালীর অপেক্ষা যে আর কোন জাতি সেয়ানা আছে, এ কথা বাঙ্গালী কোন মতেই স্বীকার করিতে চায় না। বিবেকানন্দ যদি এখান হইতে যশোলাভ করিয়া পাশ্চাত্য প্রদেশে গমন করিতেন, তাহা হইলে কোন গোল থাকিত না, কিন্তু তাঁহার যশের ডঙ্কায় যে প্রথমে সুদূর আমেরিকায় কাঠি পড়িল, এই একটা খট্‌কা আমাদের মনে রহিয়া গেল। এ দেশে তাঁহার যশোবিস্তারে এই প্রধান অন্তরায়।

দ্বিতীয় কারণ, বিবেকানন্দের প্রকৃতি আমাদের প্রকৃতির অনুযায়ী ছিল না। আমাদের যে রকম ধীর, শান্ত, নিরীহ প্রকৃতি তাহাতে বিবেকানন্দের প্রচণ্ড উত্তেজনায় আমরা কিছু বিস্মিত, কিছু ব্যথিত হইয়া থাকি। এই রজোগুণপ্রবল মহাবলবান পুরুষ আমাদের নিশ্চিন্ত আলস্য ভঙ্গ করিয়াছিলেন। আমরা অবসর মত সকল বিষয় ধীরে সুস্থে কল্পনা করিয়া থাকি, অকস্মাৎ এই ঝঞ্ঝা-বায়ুর তাড়নায় আমরা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। নহিলে, বিবেকানন্দের কথা শুনিতে আমাদের বিরাগ হয় কেন? মহাজনের নাম-কীর্ত্তন, মহাজনের কীর্ত্তি-স্মরণ আমরা প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করিয়া থাকি। 'প্রাতঃস্মরণীয়' কথাটা এই দেশে আছে, আর কোথাও নাই। যাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় তাঁহার নামে বিরক্তি জন্মিবে কেন? প্রকৃত কথা, আমরা দুর্ব্বল, বিবেকানন্দ বলবান। বলবানের গুণ গ্রহণ করিতে দুর্ব্বলের বিলম্ব হয়। কালে আমরা সকলেই বুঝিতে পারিব যে, বিবেকানন্দ আমাদের দেশে নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছেন।

এই পুণ্যভূমি এখন দুঃখিনী হইলেও রত্নপ্রসবিনী। দূর অতীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া কত মহাত্মা, কত ক্ষমতাশালী পুরুষ এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কয়েকজন ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় গিয়া যশস্বী হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে তাঁহারা কেহই শিক্ষাগুরু বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেন নাই। কেহ শিক্ষার্থী, কেহ ভারতের জন্য বিচারপ্রার্থী। বিবেকানন্দ একা সে ভাবে ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় গমন করেন নাই। তিনি গুরুর দীক্ষায় দীক্ষিত, গুরুর শিক্ষায় শিক্ষিত, গুরুর বলে বলীয়ান। আর কাহারও কাছে তিনি মস্তক অবনত করিতে জানিতেন না। এই অসহায়, নিঃসম্বল যুবক যেরূপ গর্ব্বিত ভাবে কথা কহিতেন, আর কোন ভারতবাসী ইংলণ্ডে অথবা আমেরিকায় সেরূপ ভাবে কথা কহিতে সাহস করেন নাই। জগতের শীর্ষস্থানীয় ইংলণ্ড-আমেরিকার সাক্ষাতে অধঃপতিত ভারত কিসের দর্প করিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর বিবেকানন্দ ওজোময়ী, অমৃতময়ী ভাষায় দেশে বিদেশে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

ভারতের অনেক কথা অনেক জাতির কাছে শিখিবার আছে, কিন্তু ধর্ম্মের কোন কথা কাহারও কাছে শিখিবার নাই। বিবেকানন্দের এই প্রথম কথা, এই তাঁহার শেষ কথা। কোন ইংরেজ এ দেশে হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন শুনিয়া বিবেকানন্দ প্রকাশ্যভাবে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি প্রতিবাদ করেন, তিনি তাহার পর বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, এবং স্বামীজির বিরক্তির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "আমাদের আর সকলি গিয়াছে। আমাদের দেশ আমাদের নাই, আমাদের স্বাধীনতা আমাদের নাই। জাতীয় গৌরবের সকল অঙ্গই আমরা হারাইয়াছি। আমাদের বিদ্যা বিদেশের, আমাদের লজ্জানিবারণ-বস্ত্র পর্য্যন্ত বিদেশের। আমাদের অধঃপতনের আর কি বাকি আছে! কেবল একটী সামগ্রী আমাদের নিতান্ত নিজস্ব, সেটী আমাদের ধর্ম্ম। যতক্ষণ হিন্দুর ধর্ম্ম আছে, ততক্ষণ হিন্দুর স্বাতন্ত্র্য আছে, আশা আছে। যতক্ষণ হিন্দুর ধর্ম্ম আছে, ততক্ষণ হিন্দুর বিনাশের আশঙ্কা নাই। আপনারা অপর ধর্ম্ম প্রচার করুন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। আমাদের যুক্তকরে এইমাত্র নিবেদন যে, হিন্দুধর্ম্মে আপনারা গুরুগিরি করিবেন না, তাহা হইলেই আমাদের সমূহ বিপদ। ইয়োরোপ আমেরিকার লোক আর সব জানিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের তাহারা কি জানে?"

এই অটল বিশ্বাসে ভর করিয়া বিবেকানন্দ সদর্পে উন্নত মস্তকে প্রতীচ্য জগতের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তাঁহার গুরুদেব রামকৃষ্ণ পরমহংস সাধনাসিদ্ধ হইলেও হৃদয়ের আকুলতা কাহাকেও জানাইতে পারিতেন না। তাঁহার কাছে কোন লোক ছিল না, তখন তাঁহার একটীও শিষ্য ছিল না। কাহারও সহিত দেখা করিতে যাওয়া, কিম্বা কাহাকেও ডাকিয়া নিজের কাছে আনা একেবারে তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। আর কোন উপায় না দেখিয়া তিনি সায়ংকালে ছাদে

উঠিয়া পাদচারণ করিতেন, আব হাত তুলিয়া ডাকিতেন, "ওরে কে ধর্ম্ম নিবি আয়!" সেই আহ্বান-ধ্বনি অন্তরাত্মার কোন গভীর বৈদ্যুতিক তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া কাহার মর্ম্মস্থলে ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় গুঞ্জরিত হইল! কোথা হইতে ধর্ম্ম লইতে কে আসিল, কোথা হইতে শিষ্যবর্গ আসিল, কোথা হইতে কে রামকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীমুক্তাদল একে একে সঞ্চয় করিয়া বিচিত্র মালা গাঁথিল!

ধর্ম্ম কৃপণের ধনেব মত ব্যাঙ্কে পুরিয়া কিম্বা মাটীতে পুঁতিয়া রাখা যায় না। ধর্ম্ম বিলাইবার জিনিষ, যত বিলাইবে তত বাড়িবে। বিবেকানন্দ নিঃসম্বল দরিদ্র সন্ন্যাসী, রিক্তহস্তে আমেরিকায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কাছে যে মহামূল্য ধন ছিল, তাহা শীকাগোর আকাশ-স্পর্শী প্রাসাদাবলীতে খুঁজিয়া কোথাও পাওয়া যায় না। বিবেকানন্দ ত ভিক্ষার জন্য সে দেশে গমন করেন নাই, তিনি কুবেরের অক্ষয় ভাণ্ডার বিতরণ করিবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। তাই তিনি কাহারও কাছে হাত পাতেন নাই, কাহারও সম্মুখে মস্তক অবনত করেন নাই। মরুভূমিতে তৃষিত ব্যক্তি জলের কাঙ্গাল, সেখানে সে সোণাদানা লইয়া কি করিবে? অন্তরের আত্মা যখন ধর্ম্মপিপাসু হয়, তখন অট্টালিকার বিভবে তাহার কি করিবে? মুক্তকণ্ঠে যখন বিবেকানন্দ প্রচার করিলেন যে, তিনি ধর্ম্ম শিখাইতে আসিয়াছেন, শিখিতে আসেন নাই, তিনি দান করিতে আসিয়াছেন, গ্রহণ করিতে আসেন নাই, তখন দলে দলে পুরুষ-রমণী শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য, দানপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে ঘিরিল কেন? ইয়োরোপ ও আমেরিকায় শত শত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল, তাঁহার কাছে শিক্ষা লাভ করিয়া চরিতার্থ হইল। কেবলমাত্র কৌতূহলপরবশ হইয়া তাহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় নাই। নিবেদিতার মত মেধাশালিনী রমণী কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়? নিবেদিতা বিবেকানন্দকে দেবতা-তুল্য ভক্তি করিতেন, বিবেকানন্দের ছবি প্রতিদিন পুষ্প-মাল্যে ভূষিত করিতেন।

বিবেকানন্দের পূর্ব্বে কোন ভারতবাসী ইয়োরোপ বা আমেরিকায় আপনাকে শিক্ষা-গুরু বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস করেন নাই। বিবেকানন্দ স্বদেশের ও স্বজাতির গৌরব কত বাড়াইয়া গিয়াছেন তাহাও অনুভব করিবার কি আমাদের ক্ষমতা নাই? যদি বিবেকানন্দের নাম না করিব, তাঁহার প্রসঙ্গ আলোচনা না করিব ত কাহার নাম করিব? দুর্ব্বল জাতির মধ্যে এমন মহাবলবান পুরুষের আবির্ভাব সে জাতির চিরগৌরবের বিষয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

গঙ্গাধর বাবু

স্বর্ণপুর গ্রামে শীতল রায় বড় জমিদার। জমিদারবাবুর বৃহৎ চক্‌মিলান বাড়ী, সম্মুখে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী, তাহার বাঁধান ঘাট। অন্দরে খিড়কীর দিকেও পুষ্করিণী। গ্রাম গঙ্গার উপর, শীতল রায়ের বাড়ী হইতে এক পোয়া পথ হইবে। বাড়ীর বাহিরে, পুষ্করিণীর পাড়ে গোপালজীর মন্দির। সদর বাড়ীতে জমিদারী কাছারিতে বিস্তর কর্ম্মচারী, লোক-জন, সিপাহী-শান্ত্রী। পুষ্করিণীর চারিধারে চাঁপা, কামিনী ফুল, বকুল ফুলের গাছ। বাড়ী হইতে গঙ্গার ধারে যাইবার বাঁধান রাস্তা, রাস্তার দুই ধারে প্রজারা বাস করে। গঙ্গার ধারে কয়েক ঘর মাঝির বাস। তাহাদের মধ্যে রঘু মাঝি প্রধান। রঘুর বয়স ষাইটের উপর হইবে, কিন্তু এখনও তাহার শরীরে অপরিমিত বল। রঘুর স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। তিন পুত্র—গদা, হরি ও রাম। তিন জনই জোয়ান ও বলিষ্ঠ। ঘরে এক বিধবা কন্যা, নাম বিন্দু। বিন্দু সুন্দরী ও যুবতী।

শীতল রায়ের দুই পুত্র, রাখাল ও মাধব। শীতল রায় বর্ষীয়ান, রাখাল ও মাধব যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, দুই জনেই জমিদারীর কাজ দেখে। আজ কয়েক দিন হইল শীতল রায় জমিদারী দেখিতে গিয়াছেন। তিনি যে কাছারী বাড়ীতে গিয়াছেন, সেখানে পাল্কীতে যাইতে তিন চারি দিন লাগে। ঘোড়ার ডাক বসাইলে এক দিনে যাওয়া যায়। দশ পনর দিনে শীতল রায়ের বাড়ী ফিরিয়া আসিবার কথা।

আজ প্রাতে দেউড়ীর দরওয়ান আসিয়া খবর দিল ফটকে কে একটা কাগজ আঁটিয়া দিয়া গিয়াছে। রাত্রে কখন দিয়া গিয়াছে কেহ দেখিতে পায় নাই। শুনিয়া মুহুরিখানার এক জন বাবু কাগজে কি লেখা আছে দেখিতে আসিলেন। লেখা বাঁকাচোরা, অনেক বানান ভুল, কিন্তু বেশ পড়িতে পারা যায়। কাগজে লেখা আছে—

"শিতল রাএ তুমি এই চিঠী পাইয়া কাল রাত্রী দসটার সময় গঙ্গার ধারে ইছেপুর গ্রামের অসথ গাছের তলায় কুড়ী হাজার টাকা কুড়ী তোড়ায় রাখিয়া দীবে। আমার লোক কাছে থাকিবে। অধিক লোক পাঠাইবে না। টাকা না দিলে তোমার বাড়ী কাল লুট করিব।—গঙ্গাধর"

পড়িয়া মুহুরি বাবুর মুখ শুকাইল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে কাছারী বাড়ীতে গিয়া বলিলেন, "বড় বাবু, ছোট বাবুকে খবর দাও। গঙ্গাধর বাবু চিঠি দিয়াছে।"

গঙ্গাধর ডাকাতকে লোকে গঙ্গাধর বাবু বলিত। গঙ্গাধর জাতিতে ব্রাহ্মণ, খুব সৌখীন বলিয়া তাহাকে সকলে বাবু বলিত। গঙ্গাধর উত্তম শান্তিপুরে কালো পেড়ে কোঁচান ধুতি পরিত, আতর মাখিত, আতর-মাখা উড়ানি গায় দিয়া বেড়াইত। এদিকে তাহার দলে বাছা বাছা জোয়ান, তাহার নামে সে অঞ্চলের লোক থরহরি কাঁপিত। গঙ্গাধরের চিঠি পাইয়া যে টাকা না দিত, গঙ্গাধর তাহার বাড়ী লুঠ করিয়া, বাড়ীর লোকদিগকে নিষ্ঠুর রূপে নির্য্যাতন করিয়া, বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিয়া যাইত।

তথাপি শীতল রায়ের বাড়ী ডাকাত পড়া কতকটা অসম্ভব কথা। শীতল রায়ের অধীনে অনেক লাঠিয়াল, তিনি নিজে অনেক দুষ্টের দমন করিতেন। গঙ্গাধর বাবুর দলে অনেক লোক থাকিলেও শীতল রায়ের বাড়ী আক্রমণ করা সহজ নয়। বড় বাবু ও ছোট বাবু—রাখাল ও মাধব—আসিয়া, দরজায় লেখা পড়িয়া প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। দুই ভাই বলিলেন, কেহ কৌতুক করিয়া লিখিয়া থাকিবে। তাঁহাদের আদেশ মত কাগজখানা দরজা হইতে খুলিয়া লওয়া হইল। এক জন বৃদ্ধ নায়েব ছিল, সে বলিল, "বাবু, এ ত তামাসা মনে হয় না। হুজুর এখানে নাই বলিয়া বোধ হয় গঙ্গাধর বাবু এ রকম চিঠি দিয়াছে।"

রাখাল রায় কহিলেন, "কর্ত্তা নাই বা রহিলেন, আমরা ত আছি। কর্ত্তার সঙ্গে না হয় বিশ পঁচিশ জন লোক গিয়াছে। তাহাতে কি আমরা গঙ্গাধর বাবুকে ভয় করি?"

মাধব কহিলেন, "কিন্তু তাঁহাকে না জানাইয়া কিছু করা হয় না।"

রাখাল রাগিয়া কহিলেন, "তবে কি গঙ্গাধর বাবুকে টাকা দিতে হইবে না কি?"

মাধব সংযত ভাবে কহিল, "দেওয়া না দেওয়া বাবার ইচ্ছা। আমাদের কর্ত্তব্য চিঠির কথা তাঁহাকে জানান।"

"কে জানাইবে?"

"আমি।"

"এক দিন বই ত সময় নাই।"

"আমি এখনি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছি। আজই ফিরিয়া আসিব।"

ডাকের জন্ত দুইটা ঘোড়া তখনই রওয়ানা করা হইল। এক প্রহর পরে আহারান্তে তলওয়ার বাঁধিয়া, কটিতে পিস্তল লইয়া অশ্বারোহণে মাধব রায় বেগে প্রস্থান করিলেন।

পথে দুই স্থানে ঘোড়া বদল করিয়া বেলা দুইটার সময় মাধব রায় জমিদারীর কাছারী বাড়ীতে উপনীত হইলেন। সর্ব্বাঙ্গে ধূলা। সেই অবস্থাতেই গিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া সেই কাগজখানা তাঁহাকে দেখাইলেন। কহিলেন, "কাল রাত্রে প্রহরীর অসাক্ষাতে এই কাগজ সদর দরজায় লাগাইয়া দিয়া গিয়াছে। আজ প্রাতে পাওয়া গিয়াছে।"

শীতল রায় তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়াছিলেন। মুখে আলবোলার নল ছিল। বয়স দ্বিষষ্ঠি বৎসর হইবে। দীর্ঘ ঋজু দেহ, কঠিন মাংসপেশী এখনও লোল হয় নাই। মস্তকের কেশ ও গুম্ফশ্মশ্রু এখনও সম্পূর্ণ পলিত হয় নাই; ঘন ভ্রূযুগল, তাহার নীচে উজ্জ্বল বৃহৎ চক্ষু। শীতল রায়ের বড় রাশ ভারি, লোকে তাঁহাকে সিংহরেশে বলিত।

প্রথমে শীতল রায় কোন কথা কহিলেন না। সম্মুখে চসমা পড়িয়াছিল, চসমা পরিয়া, কাগজখানা পড়িয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন। তাহার পর কহিলেন, "এ তামাসা নয়, গঙ্গাধরের চিঠি বটে। আমি বাড়ী নাই, সেই সুযোগে কিছু আদায় করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আমি হুকুম না দিলে টাকা দিবে কে?" সহসা পুত্রের দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, "তোমরা ভয় পাইয়াছ?"

মাধব মস্তক অবনত করিয়া কহিল,

"আজ্ঞে না।" দুই ভাই বাপকে যত ভয় করিত গঙ্গাধর ডাকাতকে তত ভয় করিত না।

শীতল রায়ের ললাট কুঞ্চিত হইয়া চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল ক্রোধ-কম্পিত স্বরে কহিলেন, "এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার বাড়ী লুট করিবে! আমি এখনি বাড়ী যাইতেছি, দেখিব গঙ্গাধর ডাকাত আমার কি করে।"

মাধব অবনত মস্তকে ভয়ে ভয়ে বলিল, "আজ্ঞা, পাল্কী যাইতে বিলম্ব হইবে। আমাকে আদেশ করুন, যেরূপ বলিবেন সেই মত করা যাইবে।"

শীতল রায় কহিলেন, "কেন, আমি কি এত বুড়া হইয়াছি যে ঘোড়ায় চড়িতে পারি না? আমার জন্য ঘোড়ার ডাক বসাইতে হুকুম দাও, এক ঘণ্টার মধ্যে রওয়ানা হইব।"

সেইরূপ করা হইল। এক ঘণ্টা পরে শীতল রায় ও মাধব রায় অশ্ব আরোহণ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

বাড়ী পঁহুছিতে রাত্রি দশটা বাজিল। বাড়ীর সিপাহী তাহার পূর্ব্বেই অস্ত্র শস্ত্র লইয়া পাহারা দিতেছিল। যাহারা শীতল রায়ের সঙ্গে গিয়াছিল, তাহাদের পর দিবস প্রাতে ফিরিয়া আসিবার কথা। শীতল রায় প্রথমে অন্দর-মহলে গমন করিলেন। গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "কাল রাত্রে বাড়ীতে ডাকাত পড়িবে শুনিয়াছ?"

"শুনিয়াছি।"

"এমন অবস্থায় তোমাদের এখানে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। তুমি বধূদের লইয়া বাপের বাড়ী যাও। কাল প্রাতে তোমাদিগকে নৌকা করিয়া পাঠাইয়া দিব।"

"বধূদিগকে পাঠাইয়া দাও। আমি যাইব না।"

কর্ত্তা একটু হাসিলেন, "তোমার প্রাণে ভয় নাই?"

গৃহিণী পাকা আমের মত টুক্‌টুকে সুন্দরী। কাঁচাপাকা চুল, সীমন্তে টক্‌টকে সিন্দুর। তিনিও অল্প হাসিয়া কহিলেন, "আছে বই কি। কিন্তু তোমার চেয়ে ছেলেদের চেয়ে কি প্রাণ বড় হল?"

"গঙ্গাধরের পাল্লায় অনেক লোক, কাল রাত্রে কি হয় বলা যায় না। সে ত ঘোর পাষণ্ড, যদি আমরা তাহাকে না আঁটিয়া উঠিতে পারি, তাহা হইলে অত্যাচার করিতে পারে।"

গৃহিণীর মুখে সে হাসিটুকু লাগিয়া ছিল। বলিলেন, "আমরা মেয়ে মানুষ, মরিতে জানি। কাহার সাধ্য আমাকে অপমান করে!"

কর্ত্তার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কহিলেন, "সেই কথা ভাল। বধূদিগকে বল কাল তাঁহারা বাপের বাড়ী যাইবেন।"

গৃহিণী গিয়া বধূদিগকে ডাকিলেন। তাঁহারা দুই জনে আসিয়া, শ্বশুরের পায় হাত দিয়া প্রণাম করিয়া, ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইলেন।

কর্ত্তা কহিলেন, "বড় বউমা, ছোট বউমা, কাল তোমরা বাপের বাড়ী যাও। এমন সময় তোমাদের এখানে থাকা পরামর্শ-সিদ্ধ নয়।"

দুই বউ সরিয়া শাশুড়ীর পাশে গেল। দুই জনে চুপি চুপি শাশুড়ীর কানে কানে বলিল, "ঠাকুরকে বল, আমরা বাপের বাড়ী যা'ব না, এইখানে তোমার কাছে থাক্‌ব।"

গৃহিণী হাসিয়া কর্ত্তাকে বলিলেন, "বউমারাও যে যেতে চান না!"

কর্ত্তা বলিলেন, "হুঁ, তোমাদের কাহারও যে ডাকাতের ভয় নাই দেখিতেছি। ডাকাতেরা যদি আমাদিগকে পরাজয় করে তাহা হইলে কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিবে?"

গৃহিণী ঘরের ভিতর গেলেন, আবার তখনি ফিরিয়া আসিলেন। দুই হাতে তিন খানা শাণিত খাঁড়া, দেয়ালগিরির আলোকে ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। গৃহিণী ঝনাৎ করিয়া খাঁড়া কয়েকটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই উপায়?"

কর্ত্তা গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "এ কথা যদি গঙ্গাধর জানিত, তাহা হইলে চিঠি দিতে সাহস করিত না।" এই বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে বাহিরে গমন করিলেন।

৩

সে রাত্রে কাহারও নিদ্রা হইল না। শীতল রায় আহারাদির পর অস্ত্রাগার হইতে সমস্ত অস্ত্র বাহির করিতে আদেশ করিলেন। বন্দুক পাঁচ সাতটা ছিল, অধিক ছিল না। তখন লোকে বন্দুক লক্ষ্য করিতে ভাল জানিত না। বন্দুক পুরিতেও বিলম্ব হইত। তলওয়ার, বর্ষা, সড়্‌কি অনেক ছিল, সেইগুলা শাণিত হইল। দরজায় সড়্‌কি চালাইবার জন্য বড় বড় ছিদ্র ছিল, বড় পেরেকের মাথা দিয়া সে গুলা বন্ধ ছিল। পেরেকের মাথা খুলিয়া ফেলিয়া ছিদ্রগুলা পরিষ্কার করা হইল। বাড়ীর ছাদে স্থানে স্থানে রাশিকৃত ইট পাথর সঞ্চিত হইল, ছাদের উপর হইতে স্ত্রীলোকেরা ডাকাতদিগকে ছুড়িয়া মারিবে। জানালার সমস্ত লোহার গরাদ উত্তম রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইল। পুষ্করিণী হইতে পাক তুলিয়া বাড়ীর চারিদিকে ঢালিয়া দেওয়া হইল, যাহাতে ডাকাতেরা পিছলিয়া পড়িয়া যায়। তাহার উপর ভাঙ্গা কাচ, পেরেক, বাব্‌লা কাঁটা ছড়াইয়া দেওয়া হইল। শীতল রায় গ্রামের লোকদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ডাকাতের সহিত লড়াই করিতে তাহারা প্রস্তুত আছে কি না। যুবকেরা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। রঘু মাঝি তাহার তিন পুত্রকে লইয়া সেই রাত্রেই আসিতে চায়, শীতল রায় রঘুকে আসিতে নিষেধ করিলেন, কহিলেন তাহার তিন পুত্র পর দিন আসিলেই হইবে।

পর দিবস প্রাতে জমিদারী হইতে অন্যান্য লোক জন আসিয়া উপস্থিত হইল। মধ্যাহ্নের পর গ্রাম হইতে যুবকগণ আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। তাহাদের হাতে লাঠি বর্ষা, সড়্‌কি। শীতল রায়ের অস্ত্রাগার হইতে অনেকে ঢাল ও তরবারি লইল। রঘু মাঝির তিন পুত্র আসিল, সে নিজে শীতল রায়ের আদেশ মত কন্যার কাছে ঘরে রহিল। শীতল রায়ের বাড়ীতে অন্দর-মহলের সমস্ত দ্বার-জানালা রুদ্ধ হইল। খিড়কীর দরজায় পাঁচিশ জন জোয়ান অস্ত্র লইয়া পাহারা দিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর ডাকাতেরা কোন্ পথ দিয়া আসে জানিবার জন্য দুই চারি জন লোক অগ্রসর হইয়া এ দিক ও-দিক দেখিতে লাগিল।

রাত্রি হইতে লাগিল। রাত্রি এগারটার সময় এক জন দৌড়িয়া আসিয়া সম্বাদ দিল দস্যুগণ জলপথে আসিতেছে। গ্রামের নীচে

ঘাট হইতে কিছু দূরে তিন খানা বড় বড় ছিপ লাগিয়াছে। ডাকাতেরা ছিপ হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছে। শুনিয়া শীতল রায় রঘু মাঝির পুত্রদিগকে ডাকিয়া চুপি চুপি কি আদেশ করিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ গ্রামের পথ ছাড়িয়া, বনে প্রবেশ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

৪

তিন খানা ছিপে সত্তর পঁচাত্তর জন দস্যু ছিল। কাপড় মালকোঁচা করিয়া পরা, গায় জামা নাই। সকলের অঙ্গ তৈলাক্ত। কয়েক জনের হাতে বন্দুক, অবশিষ্ট লোকের কাছে লাঠি ও তলওয়ার। যে ছিপ প্রথমে ডাঙ্গায় লাগিল তাহাতে গঙ্গাধর বাবু বসিয়াছিল। সে লম্ফ দিয়া তীরে উঠিল। তাহার পশ্চাৎ আর সকলে নামিল। ছিপ আগ্‌লাইবার জন্য প্রত্যেক ছিপে দুই জন করিয়া লোক রহিল। ডাকাতদের সঙ্গে মশাল ছিল, কয়েক জন মশাল জ্বালিল। তাহার পর তাহারা সারিবন্দি হইয়া গ্রামের অভিমুখে চলিল। আগে আগে দুই জন ঘাটির পাইক, তাহাদের হাতে শুধু এক গাছা করিয়া লম্বা লাঠি। গঙ্গাধর বাবু তাহাদের পশ্চাতে।

শীতল রায়ের বাড়ীর নিকটে আসিয়া ডাকাতেরা রে রে রে রে করিয়া একটা বিকট গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ঘাটির পাইক দুই জন তীর বেগে সশব্দে লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাহির হইয়া গেল। এক জন বাড়ীর সম্মুখ দিকে আর এক জন পশ্চাৎ দিকে গেল। তাহাদের পশ্চাতে দুই করিয়া ডাকাতেরা আসিল। ভিতর হইতে সদর দরজা বন্ধ ছিল। দরজা ভাঙ্গিবার জন্য ডাকাতদের কাছে কুড়ালি ছিল। কয়েক জন কুড়ালি লইয়া অগ্রসর হইল। এমন সময় সদর বাড়ীর ছাদের উপর হইতে গোটা কতক বন্দুকের আওয়াজ হইল। ডাকাতেরা বড় একটা কেহ জখম হইল না, কিন্তু একটা গুলি একটা ডাকাতের হাতে লাগিল। তাহার হাত ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহার হাতের তলওয়ার মাটীতে পড়িয়া গেল। এ লক্ষ্য শীতল রায়ের নিজের। দস্যু আহত হইয়াছে দেখিয়া তিনি পার্শ্বস্থ ভৃত্যকে আবার বন্দুক পূরিতে দিলেন। দস্যুরাও ছাদের অভিমুখে বন্দুক ছুড়িল, কিন্তু তাহারা ত কাহাকেও দেখিতে পাইতেছিল না, সুতরাং কাহাকেও আহত করিতে পারিল না।

ডাকাতেরা বাড়ী ঘেরাও করিল। ঘাটির দুই জন পাইক তীরবেগে বাড়ীর সম্মুখে ও পশ্চাতে ঘুরিতে লাগিল। খিড়কীর দিকে শীতল রায়ের যে সকল লোক দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের কয়েক জন ঘাটির ডাকাতকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আহত হইয়া নিশ্চেষ্ট হইল। ডাকাতের লাঠি বিদ্যুৎবেগে ঘুরিতেছিল, লাঠি কিম্বা তরবারি তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিল না।

বাড়ীর সদর দরজায় ও খিড়কীর দরজার সম্মুখে ডাকাতদের সঙ্গে শীতল রায়ের লোক-দিগের খুব লড়াই বাধিল। শীতল রায়ের পক্ষে তাঁহার নিজের লোক জন ও গ্রামের বলিষ্ঠ যুবকগণ। ডাকাত দলের সর্দ্দার গঙ্গাধর বাবু সর্ব্বত্র ডাকাতদিগকে চালনা করিতে-ছিল। তাহার তুল্য অস্ত্র-কুশলী, ক্ষিপ্রহস্ত, লঘুগামী দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। বন্দুকের আওয়াজ আর বড় শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল

না। দুই দলের লোক মেশামিশি হওয়াতে শীতল রায় আর সাহস করিয়া বন্দুক ছুড়িতে পারিতেছিলেন না। পাছে নিজের দলের কোন লোকের গায়ে গুলি লাগে।

কিয়ৎ কাল যুদ্ধের পর শীতল রায়ের লোকেরা সদর দরজার সম্মুখ হইতে হটিতে আরম্ভ করিল। অমনি ডাকাতেরা জয় ধ্বনি করিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। শীতল রায়ের লোকেরা কিছু পশ্চাতে সরিয়া আলাহিদা হইয়া গেল। অমনি ছাদের উপর হইতে মুসল ধারে ডাকাতদের মাথায় ইটবৃষ্টি হইতে লাগিল, উপর্য্যুপরি বন্দুকের আওয়াজ হইল।

গঙ্গাধর বাবু হাঁকিয়া কহিল, "দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ কর। তাহার পর সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, বাড়ী লুঠ কবিয়া, বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দিব।"

দুম্ করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। গঙ্গাধর বাবুর পাশে এক জন ডাকাত ঘুরিয়া পড়িয়া গেল, গুলি তাহার মাথায় লাগিয়াছিল। গঙ্গাধর লম্ফ দিয়া দরজার নীচে দাঁড়াইয়া, কুঠার হস্তে স্বয়ং দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হইল।

এমন সময় পুষ্করিণীর পার্শ্ব হইতে অনেক লোকের মিলিত কণ্ঠে গর্জ্জন উত্থিত হইল। অস্ত্রধারী শতাধিক জোয়ান সিংহনাদ করিয়া বেগে দস্যুদিগের প্রতি ধাবিত হইল। তাহাদের অগ্রণী শীতল রায়ের দুই পুত্র; রঘু মাঝির তিন পুত্রও সেই সঙ্গে ছিল।

শীতল রায়ের যে লোকেরা সরিয়া গিয়াছিল তাহারা এই দলের সহিত মিশিল। ছাদের উপর হইতে ইষ্টক নিক্ষেপ বন্ধ হইয়া গেল। নূতন দল আসিয়া ভীম পরাক্রমের সহিত দস্যুদিগকে আক্রমণ করিল। সে আক্রমণ ডাকাতেরা অধিক ক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া মশাল ও অস্ত্র ফেলিয়া পলায়ন করিল। শীতল রায়ের লোকেরা গঙ্গাধর বাবুকে ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, গঙ্গাধর অন্ধকারে পলায়ন করিল।

যুদ্ধ শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বেই রঘু মাঝির তিন পুত্র আরও দুই তিন জন লোককে সঙ্গে করিয়া সরিয়া গিয়াছিল।

৫

দস্যুরা পরাজিত হইয়া, বনের ভিতর দিয়া অন্ধকারে পলায়ন করিল। তাহাদের ইচ্ছা, গঙ্গাতীরে গিয়া ছিপে উঠিয়া পলায়ন করিবে। শীতল রায়ের লোকেরা জয়োল্লাস-ধ্বনি করিয়া পশ্চাদ্ধাবিত হইল।

ওদিকে রঘু মাঝির তিন পুত্র কয়েকজন লোক সঙ্গে করিয়া যেখানে গঙ্গাতীরে দস্যুদিগের ছিপ বাঁধা ছিল, সেইখানে উপস্থিত হইল। যে কয়েকজন দস্যু ছিপ রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত ছিল, তাহারা আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিল। তখন রঘু মাঝির পুত্রেরা ছিপ তিনখানা ফুটা করিয়া জলমগ্ন করিল। দস্যুদিগের পলায়নের আর উপায় রহিল না।

সেই অবধি সে অঞ্চল হইতে ডাকাতের ভয় দূর হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

কালিদাসের কাল

অবতরণিকা

ধর্ম্মপ্রাণ বৈরাগ্যময় ভারতে ধর্ম্মকাহিনী ব্যতীত অন্যরূপ ইতিহাস লেখার প্রথা পূর্ব্বকালে বড়ই বিরল ছিল। ধাম্মিক নায়কের ধর্ম্ম-প্রাণতা-চিত্র সমুজ্জ্বল করিবার জন্য অধার্ম্মিক প্রতিনায়কের চরিত্রও ধর্ম্মকাহিনীতে স্থান পাইয়াছে বটে—কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য "রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ।" সে কালে ভারতবাসী অপরা বিদ্যার অনুশীলনে মহামহিমান্বিত হইলেও যতক্ষণ না ধর্ম্মজগতে উচ্চস্থান অধিকার করিতেন, যতক্ষণ না তাঁহার নরলীলা সমাজের ধর্ম্মোন্নতির জন্য আদর্শভূত হইত, ততক্ষণ সেই লীলা বিবিধ ছন্দে শিষ্যপ্রশিষ্য দ্বারা রক্ষিত হইত না। কালিদাসাদি প্রতিভাশালী কবি হইলেও ধর্ম্মজগতে উচ্চভূমি পান নাই বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাদের জীবনী গ্রন্থাকারে রচিত হয় নাই। আর যদি ঐরূপ কোন গ্রন্থ হইয়াও থাকে তাঁহা এক্ষণে বিলুপ্ত। সুতরাং এক্ষণে তাঁহাদের জীবনী পাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তবে এই গাঢ় অন্ধকার মধ্যে পুরুষপরম্পরা-প্রবাহিত প্রবাদ যেন আমাদিগকে ক্ষীণালোক দেখাইতেছে। সেই আবহমানকাল-প্রবর্ত্তিতা জনশ্রুতি ভারতে বরাবরই বিশ্বস্ত হইয়াছে, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রবাদ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বিশিষ্ট প্রমাণ চান্। প্রবাদকে উপেক্ষা করিয়া যুক্তিবলে কেবলমাত্র কালিদাসাদির কাল স্থির করিতে পারিলেই তাঁহাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন হইল বিবেচনা করিয়া তাঁহারা ঐ কাল সম্বন্ধে নানারূপ বাগ্‌বিতণ্ডার অবতারণা করিয়াছেন। আক্ষেপের বিষয় আমাদের দেশের অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের কৃষ্ণ-পথানুসরণে আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন। তাঁহারাও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের ন্যায় স্বীয় স্বীয় মত চালাইবার জন্য ব্যস্ত। এইরূপ বাগ-বিতণ্ডায় ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যায় না। সেইজন্য আমরা পূর্ব্ব হইতে কোন মত স্থির করিয়া সেই মতের পরিপোষণের জন্য হেত্বাভাসকে হেতুরূপে উপস্থাপিত করিতে অভিলাষী নহি। যথার্থ ইতিহাসতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসুর যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিব। অগ্রে কালিদাসের কালবিষয়ক প্রাচ্য-প্রতীচ্য-বাদগুলি সমালোচনা করিয়া পরে নিরপেক্ষ-ভাবে কালিদাসের কাল সম্বন্ধে যাহা বলিবার বলিব।

১। প্রবাদ

কালিদাসের কাল সম্বন্ধে আমাদের দেশে প্রবাদ এই যে, তিনি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একজন রত্ন। ঐ বিক্রমাদিত্য শকগণকে জয় করিয়া হিন্দু-গৌরব সংবর্দ্ধিত করেন। তিনিই সংবৎপ্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার কালেই উজ্জয়িনী যথার্থ উজ্জয়িনী হয়। এখনও পান্থগণকে পাণ্ডারা সেই মহাকালের মন্দির, সেই বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনীর ভগ্নাবশেষ, সেই ভর্ত্তৃহরির গুহা দেখাইয়া থাকেন।

এখনও দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাদি গ্রন্থ সেই ভর্তৃহরি, সেই বিক্রমাদিত্যের অবদানের সাক্ষ্য দিতেছে। এখনও কাশ্মীর-রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতিতে ঐ বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখনও প্রতিবৎসর নূতন নূতন তাম্র-শাসন, শিলালিপি প্রভৃতি বিক্রম-সংবদঙ্ক বক্ষে ধারণ করিয়া যেন বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্বের পরিচয় দিবার জন্য ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছে। সুতরাং এই প্রবাদমূলে যে, সত্য নিহিত নাই তাহা অকুণ্ঠিতভাবে বলা যায় না। এই প্রবাদের পরিপোষক প্রমাণও যে একেবারে নাই তাহা নহে। উজ্জয়িনী যে কালিদাসের কালে ভারতের কণ্ঠহার ছিল তাহা মেঘদূতে উজ্জয়িনীর বর্ণনা হইতে জানা যায়। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞান শকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্রে কালিদাস প্রাচীনকালের ছবি দেখাইতে গিয়া তত্তৎ-কালোচিত ঘটনা সন্নিবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেই সেই গ্রন্থে স্বকালীন সমাজের চিত্র দেখাইতে তিনি তাদৃশ প্রসর পান নাই। কিন্তু মেঘদূতে তাঁহার সেই প্রসর যথেষ্ট আছে। তজ্জন্য মেঘদূতেই তাঁহার কালের চিত্র যত পরিস্ফুট পাওয়া যাইবে, অন্য কোন গ্রন্থে তাহা পাওয়া যাইবে না। মেঘদূতে তিনি উজ্জয়িনীর অবতারণা যে ভাবে করিয়াছেন তাহাতে উজ্জয়িনী তাঁহার বড়ই আদরের ধন বুঝায়। তাঁহার বিরহী যক্ষ মেঘকে উজ্জয়িনী যাইবার জন্য এইরূপে অনুরোধ করিতেছেন :—

বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্মভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি॥

পূর্ব্ব মেঘ, ২৮ শ্লোক।

(হে মেঘ!) যদিও তুমি উত্তরদিকে প্রস্থিত বলিয়া (উজ্জয়িনী যাইতে হইলে) তোমার ঠিক সোজা পথ হইবে না, তথাপি উজ্জয়িনীর সৌধনিচয়ের সহিত আলাপ করিয়া যাইও। সেই নগরের অঙ্গনাগণের সহজ চঞ্চল নয়ন (তোমার আগমনে) স্ফুরিত বিজলী ছটায় যখন চকিত হইবে, যদি সেই শোভা না দেখ তোমার নয়নই বৃথা।

উজ্জয়িনীর বর্ণনা আবার এইরূপ :—

প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্
পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং।
শেষৈঃ পুণ্যৈঃ হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎখণ্ডমেকং॥ ৩০
দীর্ঘীকুর্ব্বন্ পটু মদকলং কূজিতং সারসানাং।
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ॥ ৩১
জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈ-
র্বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ।

হর্ম্ম্যেষস্যাঃ কুসুমসুরভিষধ্বখেদং নয়েথাঃ
লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু ॥ ৩২
ভর্ত্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ
পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডীশ্বরস্য।
ধূতোদ্যানং কুবলয়রজোগন্ধিভির্গন্ধবত্যা
স্তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতিস্নানতিক্তৈর্মরুদ্ভিঃ ॥ ৩৩ ॥
অপ্যন্যস্মিন্ জলধরমহাকালমাসাদ্য কালে
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ।
কুর্ব্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়াম্
আমন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জ্জিতানাং ॥ ৩৪ ॥
পাদন্যাসৈঃ ক্বণিতরশনাস্তত্র লীলাবধূতৈ-
রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।
বেশ্যাস্ত্বত্তোনখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দূন্
আমোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণীদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ ॥ ৩৫ ॥
পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজবনতরুং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা ॥ ৩৬ ॥

উজ্জয়িনী অবন্তি প্রদেশের রাজধানী শিপ্রানদীতটে অবস্থিত। তাহার ঐশ্বর্য্যশ্রী অতুলনীয় সুতরাং তাহাকে দেখিতে ভূপতিত স্বর্গখণ্ড বলিয়া বোধ হয়। তাহার সপ্তভূমি হর্ম্ম্যরাজি কুসুমসুরভি ও ললিতবনিতা-পাদাঙ্কিত। তথায় প্রতিভবনে শিখি নৃত্য করিতেছে। ললনাগণের কেশ-সংস্কার-ধূপের ধূম বাতায়ন হইতে উত্থিত হইতেছে। শিপ্রাবক্ষে মদকল সারসকুল ক্রীড়া করিতেছে। কমলিনী যেন হাসিতেছে। মৃদুমন্দসমীরণ যেন তাহাদের সহিত খেলিয়া তাহাদের পরাগে সুগন্ধী হইয়া সারসগণের কূজন দীর্ঘীভূত করিতেছে। উজ্জয়িনী কেবল বিলাসভূমি নহে, মহাপুণ্যেরও আয়তন। তথায় ত্রিভুবন-গুরু মহাকাল অবস্থিত। দেবাদিদেবের আরত্রিক মহাসমারোহে হইয়া থাকে, স্বয়ং মহাকাল তথায় নৃত্য করেন ইত্যাদি।

উজ্জয়িনী বর্ণনা দর্শনে মনে হয় যে, কালিদাসের কালে উজ্জয়িনীর ন্যায় ভারতে আর দ্বিতীয় নগরী ছিল না। যদিও রামায়ণে অবন্তি প্রদেশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, তথাপি রামের পিতামহী ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে কালিদাস অবন্তিনাথকে তথায় আনিয়াছেন ও সুনন্দার মুখে তাঁহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন।

অবন্তিনাথোঽয়মুদগ্রবাহুবিশালবক্ষাস্তনুবৃত্তমধ্যঃ।
আরোপ্য চক্রভ্রমমুষ্ণতেজাস্ত্বষ্ট্রেব যত্নোল্লিখিত বিভাতি॥ ৩২
অস্য প্রয়াণেষ্বসমগ্রশক্তেরগ্রেসরৈর্বাজিভিরুত্থিতানি।
কুর্ব্বন্তি সামন্তশিখামণীনাং প্রভাপ্ররোহাস্তময়ং রজাংসি॥ ৩
অসৌ মহাকালনিকেতনস্য বসন্নদূরে কিল চন্দ্রমৌলেঃ।
তমিস্রপক্ষেঽপি সহ প্রিয়াভির্জ্যোৎস্নাবতোনির্ব্বিশতি প্রদোষান্॥ ৩৪
অনেন যূনা সহ পার্থিবেন রম্ভোরু! কচ্চিম্মনসো রুচিস্তে।
শিপ্রাতরঙ্গানিলকম্পিতাসু বিহর্ত্তুমুদ্যানপরম্পরাসু॥ ৩৫
তস্মিন্নভিদ্যোতিত বন্ধুপদ্মে প্রতাপসংশোষিত শত্রুপঙ্কে।
ববন্ধ নোত্তমসৌকুমার্য্যা কুমুদ্বতী ভানুমতীব ভাবং॥ ৩৬॥

রঘুবংশে ৭ম সর্গে

এই মহাবাহু, বিশালবক্ষা, ক্ষীণমধ্য অবন্তিনাথ যেন বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক শাণোল্লিখিত উষ্ণতেজোময় সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান। সমগ্র শক্তি এই নৃপতির যুদ্ধপ্রয়াণে অশ্বখুরোত্থিত ধূলি সামন্তরাজবর্গের শিখাস্থিত মণিনিচয়ের জ্যোতি মলিন করে। ইনি মহাকাল-নিকেতন চন্দ্রমৌলির নিকটে বাস করেন বলিয়া কৃষ্ণপক্ষেও প্রিয়াগণের সহিত জ্যোৎস্নাময়ী রজনী উপভোগ করেন। অয়ি বামরম্ভোরু! এই যুবক পৃথিবীপতির সহিত শিপ্রাতরঙ্গানিল-কম্পিত উপবনে বিহার করিবার সাধ হয় কি? ইহা শুনিয়াও কুমুদ্বতী যেরূপ ভানুর প্রতি রত হন না, সেইরূপ সুহৃৎপদ্মবিকাশক শত্রুপঙ্কশোষক সেই নৃপতির প্রতি অত্যন্ত সুকুমারী সেই রাজনন্দিনী রত হইলেন না।

এই বর্ণনা হইতে উজ্জয়িনীর প্রতি কালিদাসের পক্ষপাতিত্ব বুঝায় বটে; উজ্জয়িনী পতি তাঁহার উপজীব্য বলিয়াও বোধ হয় বটে, তথাপি ইহা হইতে তাঁহার কাল নির্ণয় হয় না। উজ্জয়িনী নাম মহাভারতে নাই, কিন্তু পাণিনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উজ্জয়িনী অন্যন সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ছিল বুঝায়। ইহার অভ্যুদয় সংবৎপ্রচলনের পূর্ব্বে যে হইয়াছে তাহাও মৃচ্ছকটিকাদি গ্রন্থ হইতে বোধ হয়। জ্যোতির্ব্বিদাভরণে বিক্রমাদিত্যের সভায় ইহার গৌরব-বৃদ্ধির পরিচয় পাই। আবার যশোধর্ম্ম নৃপতির বিজয়স্তম্ভ হইতে জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতেও উজ্জয়িনীর মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল। যশোধর্ম্ম বিক্রমাদিত্য ৫৪০ খৃষ্টাব্দে করুর যুদ্ধে প্রবলপরাক্রান্ত হূণরাজ মিহিরকুলের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য পূর্ব্বে লৌহিত্য, দক্ষিণে মহেন্দ্র পর্ব্বত, উত্তরে হিমাচল ও পশ্চিমে সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং কোন কোন পণ্ডিত কালিদাসকে যশোধর্ম্মের সভাসদ্ বলিয়া ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি স্থির করিয়াছেন। আবার কেহ বা গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্তের কেহ বা কুমারগুপ্তের আশ্রয়ণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং কেবল উজ্জয়িনীর উন্নতির সহিত কালিদাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত

হইলেও তদ্দ্বারা তাঁহার কাল নির্ণয় হয় না।

২। জ্যোতির্ব্বিদাভরণ

প্রবাদের পরিপোষক প্রমাণের মধ্যে জ্যোতির্ব্বিদাভরণই প্রধান। ইহা কালিদাসের নামে প্রচলিত, কলিযুগের ৩০৬৮ অব্দে অর্থাৎ খৃষ্টজন্মের ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত বলিয়া প্রকাশ। ইহা মহাকবি কালিদাসের কৃতি হইলে তাঁহার ও তাঁহার উপজীব্য বিক্রমাদিত্যের কাল নির্ণয়ে কোন গোল থাকে না। প্রধানতঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রের গ্রন্থ হইলেও ইহাতে বিক্রমাদিত্যের ও তাঁহার নবরত্নের পরিচয় আছে। কিন্তু এই পুস্তকের প্রামাণিকতা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।

অস্মদ্দেশীয় যথার্থ সংস্কৃতাভিজ্ঞ পাণ্ডিতগণ ইহাকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন। কালিদাসের কাব্য এবং নাটকে জ্যোতিষতত্ত্বের উল্লেখও পাওয়া যায়। তদ্দৃষ্টে জ্যোতির্ব্বিদাভরণের ন্যায় গ্রন্থ লেখা কালিদাসের পক্ষে সম্ভব বলিয়া অস্মদ্দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর মত, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিত কার্ন্ সাহেব জ্যোতির্ব্বিদাভরণকে জাল পুঁথি বলেন। বোম্বায়ের প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ ভৌদাজিরও সেই মত। নব্য প্রাচ্য পণ্ডিতগণও তাই জ্যোতির্ব্বিদাভরণকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন না। ডাক্তার কার্নের সংশয়ের প্রধান কারণ এই যে, কালিদাসের সহিত বরাহমিহিরকে জ্যোতির্ব্বিদাভরণে একসূত্রে গ্রথিত করা হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে প্রবাদ তাহা জ্যোতির্ব্বিদাভরণের নিম্নলিখিত শ্লোকের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বোধ হয়।

ধন্বন্তরি-ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কু-
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

বুদ্ধগয়ার মন্দিরে যে শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও নবরত্নের উল্লেখ আছে। অধ্যাপক কার্ন্ সাহেব তর্ক করেন যে, খ্যাত বরাহমিহির বৃহৎসংহিতা ও পঞ্চসিদ্ধান্তিকাকার বরাহমিহির ভিন্ন আর অন্য ব্যক্তি হইতে পারেন না। পঞ্চসিদ্ধান্তিকাকার রোমক সিদ্ধান্ত মতে অহর্গণগণনার প্রণালী পরিচয়ে লিখিয়াছেন যে, শকাব্দ ৪২৭ বৎসর বিয়োগ করিতে হইবে। সুতরাং পঞ্চসিদ্ধান্তিকাকার ৪২৭ শকের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না। অন্যান্য নিদর্শন হইতেও কার্ন্ সাহেব বরাহমিহিরকে ষষ্ঠ শতাব্দীর জ্যোতিষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জ্যোতির্ব্বিদাভরণ যখন বরাহমিহিরকে কালিদাসের সমকালীন করিয়াছে, তখন তাহা নিশ্চয় জাল পুঁথি। অধ্যাপকবরের এই যুক্তি সমীচিন বলিতে পারা যায় না। তাঁহার হেতুর প্রথম অংশ অর্থাৎ পঞ্চসিদ্ধান্তিকাকার বরাহমিহির ভিন্ন আর কোন খ্যাত বরাহ-মিহির ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে ছিলেন না এই অংশ সত্য নহে। পরে আমরা দেখাইয়াছি যে, পঞ্চসিদ্ধান্তিকাকার বরাহ-মিহিরের পূর্ব্ববর্ত্তী আরও দুইজন বরাহ-মিহিরের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম সংবৎ শতাব্দীতে তৃতীয় বরাহ-মিহির থাকা অসম্ভব নহে। সুতরাং কালিদাস ও বরাহমিহিরকে একত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়াছে বলিয়াই জ্যোতির্ব্বিদাভরণ অপ্রামাণিক হইতে পারে না। বোম্বাই প্রদেশের ডাক্তার

ভৌদাজী জ্যোতির্ব্বিদাভরণের রীতি পর্য্যালোচনা করিয়া বলেন যে, উহার স্থানে স্থানে এমন যতিভঙ্গ আছে ও এমন শ্লোক আছে যাহা কালিদাসের ন্যায় কবির রচনা হইতেই পারে না। তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, রীতি লইয়া তর্ক করা কেবল বিদ্যা প্রকাশ মাত্র। একই লেখকের বিষয়ভেদে রীতিভেদ দেখা যায়। জ্যোতির্ব্বিদাভরণে কালিদাস জ্যোতিঃশাস্ত্রোপযোগী লিখন-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন ও কাব্যে কাব্যোপযোগী বৈদর্ভী রীতির আশ্রয় লইয়াছেন। সুতরাং রীতি হইতে কোন সিদ্ধান্ত স্থির করা সুকঠিন। তবে যখন জ্যোতির্ব্বিদাভরণ সম্বন্ধে মতভেদ, তখন তাহার উপর নির্ভর করাও সম্যক্ যুক্তিযুক্ত নহে।

৩। ভোজ প্রবন্ধ

ভোজ প্রবন্ধে কালিদাসের উল্লেখ আছে। ইহাতে কালিদাস ভবভূতি বাণভট্ট প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কবিদিগকে একত্রে সিন্ধুল রাজার পুত্র ধারানগরীর ভোজরাজের সভাসদ্ বলায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থকেও জাল পুস্তক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভোজ-প্রবন্ধের নায়ক ভোজরাজ যে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর নৃপতি তদ্বিষয়ে নবাবিষ্কৃত তদীয় দান-পত্রাদি হইতে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না। বাণভট্ট যে কান্যকুব্জের শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের সভাসদ্ ইহা তাঁহার হর্ষ চরিতাদিতে প্রকাশ, সুতরাং বাণ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর লোক; আমাদের কালিদাস যে বাণভট্টের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা বাণভট্ট স্বয়ং হর্ষ-চরিতে স্বীকার করিয়াছেন। অতএব যে পুস্তকে বাণ ও কালিদাস ও ভোজ রাজাকে সমকালীন করা হয় সে পুস্তক বিশ্বাসযোগ্য নহে ইহা যৌক্তিক কথা। কিন্তু এ বিষয়েও ইহা বিবেচ্য যে ভোজ প্রবন্ধের বাণ কাদম্বরীর বাণ কি না, ভোজ প্রবন্ধের কালিদাস শকুন্তলাদির কালিদাস কি না। বল্লাল মিশ্র স্বীয় পুস্তকে কোথাও এরূপ কথা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার উল্লিখিত কালিদাস আমাদের কালিদাস নহে, পরন্তু তিনি ১১শ শতাব্দীর অন্য কালিদাস বলিলে সব গোল মিটিয়া যায়। ভোজ প্রবন্ধও জাল পুস্তক হয় না, আমাদের কালিদাস ১১শ শতাব্দীতে আসেন না। যাহা হউক ভোজ-প্রবন্ধ হইতে আমাদের কালিদাসের কাল স্থির করা যাইতে পারে না।

শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

নব বর্ষ

উষার কণকরাগে রঞ্জিত পূরবে
ধূসর গগন,
কোকিলের উচ্ছ্বসিত মাঙ্গলিক গীতে
ধ্বনিত কানন ;
সমীর বুলায় ধীরে ধরণীর দেহে
পুলক-পরশ,
সমাগত শুভক্ষণে নূতন অতিথি—
নূতন বরষ।

উঠ, আজি দেখ চেয়ে—নূতন প্রভাতে
নূতন উৎসব,
রাখ ত্বরা পুরদ্বারে পূর্ণকুম্ভ'পরে
নবীন পল্লব ;
আন ধান্য দূর্ব্বা নব গন্ধ পুষ্পরাজি
করি' আহরণ,
বাজাও মঙ্গল শঙ্খ—লহ অতিথিরে
করিয়া বরণ।

৩

হে অতিথি, হে দেবতা—সৌম্য-দরশন,
এস তবে ঘরে,—
জানি না, এসেছ লয়ে কি মহাবারতা
মানবের তরে !
বর্ষে বর্ষে যা দিয়েছ—শুধু তাই ল'য়ে
এসেছ কি আজি
ওগো বন্ধু পুরাতন—বর্ষ-অবসানে
নব বেশে সাজি'।

৪

আজি বর্ষ-প্রভাতের এই হর্ষ-গান—
সোণার স্বপন,
পত্র-পুষ্পমুকুলের শোভা অভিনব—
সৌরভ এমন,
নব সুরে বাঁধা আজি এই সুমধুর
বীণাব ঝঙ্কার—
দিনান্তরে এর কোন স্মৃতি-অবশেষ
রহিবে কি আর।

৫

রহিবে জীবনপথে সেই পুরাতন
বাধাবিঘ্ন শত,
পদে পদে ঘৃণাদ্বেষ-স্বার্থের সংঘাত
বিরোধ সতত।
কে মিটাবে চিরতৃষা—অতল-উত্থিত
সুধাধারা দানে!
ক্লিষ্ট মানবের হিয়া আছে নূতনের
চাহি' পথ পানে।

৬

স্বাগত অতিথি ; সেই মহা নূতনের
অগ্রগামী দূত
এমনি আসিয়া কত যাইবে আবার
বরষ অযুত।
একদা সে নববর্ষ আনিবে ধরায়
প্রেমের প্লাবন
অতীতের নব দেহে দিবে সঞ্চারিয়া
নূতন জীবন।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

প্রিণ্টার—কে, সি, চক্রবর্ত্তী, গিরিশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌, ৫২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।